২৮তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৬

- সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান
- সন্তান প্রতিপালন
- যুবসমাজের কতিপয় সমস্যা
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের ঝুঁকি
- মা দিবস ও বৃদ্ধাশ্রম : ইসলামী দৃষ্টিকোণ
- সফল খতীব হওয়ার উপায়

মেঘের রাজ্য সাজেকে

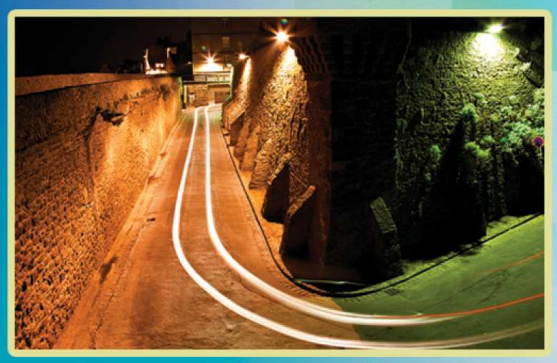

জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবার কতিপয় কারণ

Contents

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

২৮তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৬

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
- **তাবলীগ** ৫
  সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান
  অনুবাদ : নূরুল ইসলাম
- **তারবিয়াত** ১১
  সন্তান প্রতিপালন
  মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
- **চিন্তাধারা** ১৫
  মা দিবস ও বৃদ্ধাশ্রম : ইসলামী দৃষ্টিকোণ
  লিলবর আল-বারাদী
- **সাময়িক প্রসঙ্গ** ২০
  কর্মক্ষেত্রে নারীদের ঝুঁকি
  অনুবাদ : কানিজ ফাতেমা স্মৃতি
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন** ২৪
  দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
  মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **মনীষীদের লেখনী থেকে** ২৬
  যুবসমাজের কতিপয় সমস্যা (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
  মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন
- **প্রবন্ধ** ৩৩
  জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবার কতিপয় কারণ
  ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **শিক্ষা ও সাহিত্য** ৩৯
  সফল খতীব হওয়ার উপায় (২য় কিস্তি)
  মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- **কবিতা** ৪১
  - স্বীকৃতির প্রতিদান
  - আহলেহাদীছ কি?
  - জীবনের মানে
  - এগিয়ে চল সম্মুখপানে
- **পরশ পাথর** ৪২
  গুয়ানতানামো বে'র কারারক্ষীর ইসলাম গ্রহণ
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৪৪
- **দেশ পরিচিতি** ৪৫
  জর্দান
  মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
- **ভ্রমণস্মৃতি** ৪৯
  মেঘের রাজ্য সাজেকে
  আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব** ৫৪
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৫
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৬

Contents

সম্পাদকীয়

একজন দাঈ ইলাল্লাহ ডা. আব্দুর রহমান আস-সুমাইত্বের কথা

আব্দুর রহমান বিন হামূদ আস-সুমাইত্ব (১৯৪৭-২০১৩ইং)। কুয়েতী এই চিকিৎসক সমকালীন বিশ্বে মানবসেবার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবনের ২৯টি বছর আনুষ্ঠানিকভাবে মানবসেবার কাজে নেমে আফ্রিকার অন্ততঃ ২৯টি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের জীবনে হাসি ফুটিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ সময়ে তাঁর হাত ধরে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছে অন্ততঃ ১১ মিলিয়ন তথা ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ। তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে তিনি সশরীরে আফ্রিকার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন মরুভূমিতে। গহীন বন-জঙ্গল পেরিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে গিয়েছেন। আফ্রিকার সর্বোচ্চ চূড়া মাউন্ট কিলিঞ্জোমারো পর্যন্ত আরোহণ করেছেন। এসব যাত্রায় কখনও তিনি বিভিন্ন মিলিশিয়া গোষ্ঠীর হামলার শিকার হয়েছেন। কখনও বিদ্যুৎ-পানিবিহীন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। জঙ্গলে বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুর আক্রমণের শিকার হয়ে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পেয়েছেন। কোন কিছুই তাকে পিছপা করতে পারেনি। বিরামহীন কঠোর পরিশ্রমের ফলে জীবনের শেষদিকে তিনি নানা রোগে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েন। এতদসত্ত্বেও অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি দাওয়াতী মিশন অব্যাহত রেখেছিলেন। মৃত্যুর প্রায় বছর খানিক পূর্বে তিনি কোমায় চলে যান। সে অবস্থায় কখনও কখনও জ্ঞান ফিরলে তিনি একটি কথাই জিজ্ঞাসা করতেন- 'আফ্রিকার অসহায় মানুষদের কি অবস্থা, দাওয়াতের কি অবস্থা?'

জীবনের শুরুকাল থেকেই তিনি দারিদ্র্যের কষ্টকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। তিনি যখন ছাত্র ছিলেন, তখন তীব্র গরমে রাস্তায় পাবলিক ট্রান্সপোর্টের জন্য অপেক্ষমাণ শ্রমিকদের দেখে খুব কষ্ট পান। তাদের দুর্দশা লাঘবে সেই বয়সেই তিনি বন্ধুদের নিয়ে পুরোনো গাড়ি ক্রয় করে বিনা ভাড়ায় তাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার কাজ শুরু করেন। ১৯৭২ সালে তিনি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার পর ১৯৭৪ সালে লন্ডন এবং ১৯৭৮ সালে কানাডা থেকে উচ্চতর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। অতঃপর দেশে ফিরে চিকিৎসা পেশায় জড়িত হওয়ার পরিকল্পনা করলেও স্ত্রীর উৎসাহে অবশেষে তিনি শৈশবের স্বপ্ন তথা প্রান্তিক মানবসেবাকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেন। কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন আফ্রিকাকে। হিসাববিজ্ঞানে উচ্চডিগ্রীধারী তাঁর স্ত্রী কেবল উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া অর্থ-সম্পদ দান করে দেন এই কার্যক্রমে। কুয়েতের আয়েশী জীবন ত্যাগ করে স্বামীর সাথে মাদাগাস্কারের মানাকারা গ্রামের ছোট্ট একটি গৃহে বসবাস শুরু করেন। দুস্থ, অশিক্ষিত, সভ্যতার আলোকহীন কালো মানুষদের জন্য তাঁরা কেবল বৈষয়িক সহযোগিতাই নয়, বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার সার্বিক ব্যবস্থা করেন। সেখানকার মুসলিম সম্প্রদায়গুলো নামে মুসলমান হলেও তাদের কৃষ্টি-কালচার ছিল কবর-মাযারকেন্দ্রিক শিরক ও বিদ'আতে আচ্ছন্ন। এই দৃশ্য দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাঁদের মধ্যে তাওহীদের বিশুদ্ধ দাওয়াত প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর কার্যক্রম ধীরে ধীরে আফ্রিকার ২৯টি দেশে বিস্তার লাভ করে। তিনি সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহে একের পর এক হাসপাতাল, ইয়াতীমখানা, হিফযখানা, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করতে থাকেন। এভাবে দুর্ভিক্ষ ও অজ্ঞতার করাল গ্রাসে ডুবে থাকা আফ্রিকার কয়েক কোটি হতদরিদ্র মানুষ তাঁর মাধ্যমে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন খুঁজে পায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে তাঁর এই মানবিক কার্যক্রমে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

দুস্থ মানবতার সেবায় ময়দানে নামলেও মূলতঃ দ্বীনের দাওয়াতই পরিণত হয় তাঁর ধ্যানজ্ঞান। প্রতিটি পদক্ষেপেই যেন তিনি দ্বীন প্রচারের সুযোগ নিতেন। এমনি একদিনের ঘটনা। কোন এক গ্রামে গিয়ে মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করার পর নিজে তিনি খেতে বসে উচ্চৈঃস্বরে বললেন- 'একমাত্র আল্লাহ, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও জীবন-মৃত্যুর মালিক, তিনিই তাঁর অসীম অনুগ্রহে আমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন'। তাঁর এই ছোট্ট কথাটিই উপস্থিত মানুষদের হৃদয়ে দাগ কেটে গেল এবং সাথে সাথে তারা ইসলাম কবুল করে নিল। কখনও দেখা যেত পুরো একটি গ্রাম তাঁর সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি বলতেন, যদিও আমার ইসলাম প্রচারের অভিজ্ঞতা ২৫/২৬ বছরের বেশী নয়, তবুও আমি বলব মানুষের প্রতি সুন্দর আচরণই দাওয়াতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। তিনি বলেন, 'আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হ'ল, যখন আমি দেখি কারো শাহাদাত আঙ্গুলি প্রথমবারের মত আকাশমুখী হয়ে আল্লাহ্র একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে'।

ব্যক্তিজীবনে তিনি কখনও বিশ্রামের কথা ভাবেননি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোথায় থামতে চান? তিনি বলেন, 'মৃত্যু না আসা পর্যন্ত আমার বিরতি নেয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা হিসাবের দিনটি খুব কঠিন। তোমরা জান না আব্দুর রহমান কত বড় পাপিষ্ঠ। আমি কিভাবে অবসর নেব যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ হেদায়াতের দাওয়াত পেতে উন্মুখ হয়ে আছে? কিভাবে আমি বসে থাকতে পারি, যখন এই নওমুসলিম সন্তানদেরকে পুনরায় দ্বীন থেকে দূরে সরানোর জন্য ইসলাম বিরোধীরা তৎপর রয়েছে?'

২০১৩ সালে এই মহান দাঈ ইলাল্লাহ চিরবিদায় গ্রহণ করেন। স্বীয় কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ 'বাদশাহ ফায়ছাল পুরস্কার' সহ বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। তবে সেসব পুরস্কার থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ মানবতার সেবায় দান করে দিয়েছেন। মানুষকে সর্বদা মানবতার কল্যাণে অগ্রগামী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে বলতেন, 'আমাদের প্রত্যেকেরই একটি মিশন থাকা উচিৎ, যা হবে এই পৃথিবীকে অধিকতর উত্তম পৃথিবী হিসাবে রেখে যাওয়ার মিশন'। তিনি বলতেন, 'তোমাদের সবাইকে আফ্রিকায় গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে তা নয়; কিন্তু কখনও নিজ গৃহে ও নিজ সমাজে দাওয়াত দেয়া বন্ধ করো না। মানুষের সামনে নিজেকে উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন কর। যেন মানুষ তোমাকে দেখে কল্যাণের পথে উৎসাহিত হয়' ।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মুসলিম তরুণরা কেবল মাদার তেরেসারদের কথাই জানে। অথচ তাদের প্রকৃত রোল মডেলরা দৃশ্যপটের আড়ালেই থেকে যান। ডা. আব্দুর রহমান সুমাইতের মত নিষ্ঠাবান মহান দাঈ'র কথা আমরা ক'জনেই বা জানি! অথচ তাঁদেরই কিনা হওয়ার কথা ছিল তরুণদের প্রেরণাবাতি! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মহান মানবসেবী দাঈকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন এবং মুসলিম তরুণ সমাজকে তাঁর মত দাঈদের পদাঙ্ক অনুসরণে দ্বীনের প্রকৃত খাদেম হিসাবে গড়ে ওঠার তাওফীক দান করুন- আমীন!

মধ্যপন্থা

আল-কুরআনুল কারীম :

১- مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا-

(১) 'যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

২- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ-

(২) 'এমনিভাবে আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মত হিসাবে মনোনীত করেছি। যাতে তোমরা মানবজাতির উপরে সাক্ষ্যদাতা হও এবং রাসূল (মুহাম্মাদ) তোমাদের উপরে সাক্ষ্যদাতা হ'তে পারেন। আর যে ক্বিবলার উপরে তুমি ছিলে, সেটাকে আমরা এজন্যেই নির্ধারণ করেছিলাম যাতে আমরা জানতে পারি, কে এই রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। বিষয়টি অবশ্যই কঠিন। কিন্তু তাদের জন্য নয়, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের (বিগত ক্বিবলার) ছালাতকে বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াবান' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*।

৩- هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ-

(৩) 'তিনি তোমাদেরকে পসন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক, তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানব মণ্ডলীর জন্য' *(হজ্জ ২২/৭৮)*।

٤- يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ-

(৪) 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না। যাতে তোমরা (এক মাসের) গণনা পূর্ণ কর। আর তোমাদের সুপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

٥- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

(৫) 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুপথ ভ্রান্তপথ হ'তে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষণে যে ব্যক্তি তাগূতে অবিশ্বাস করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ব্যক্তি এমন এক মযবূত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা কখনোই ভাঙ্গবার নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*।

হাদীছে নববী :

٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ-

(৬) 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি তাকে কঠোর করতে যাবে, তা তার পক্ষে কঠোর হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা সৎকর্ম কর ও মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। সুসংবাদ দিবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও শেষ রাত্রে ইবাদত দ্বারা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৬)*।

٧- عَنِ ابْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّهُ أَبَا مُوْسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا وَتَطَاوَعَا وَلا تَخْتَلِفَا -

(৭) 'ইবনু আবু বুরদা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার দাদা আবূ মূসা ও মু'আযকে ইয়ামনে প্রেরণ করলেন। তখন তিনি বললেন, 'মানুষের সাথে সহজ কর, কঠোরতা আরোপ কর না। তাদের সুসংবাদ শুনাও, তাড়িয়ে দিও না। একমত হবে মতভেদ করবে না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ,মিশকাত হা/৩৭২৪)*।

٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِتَشْدِيدِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَسَتَجِدُونَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ-

Contents

(৮) সাহাল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের নফসের উপরে কঠোরতা আরোপ করো না। পূর্ববর্তী উম্মত নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করায় ধ্বংসে নিপতিত হয়েছে। নিশ্চয়ই তোমরা তাদের নিদর্শনাসমূহ মন্দির-উপাসনালয় সমূহে দেখতে পাবে' *(বায়হাক্বী শু'আব, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১২৪)*।

৯- عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخَي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِيْ الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّدَاءَ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ مَا شَأْنُك؟ قَالَتْ أَخُوْكَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِيْ الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ كُلْ فَقَالَ إِنِّيْ صَائِمٌ، فَقَالَ مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ سَلْمَانُ نِمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْآنَ فَصَلَّيَا جَمِيْعًا، وَقَالَ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَدَقَ سَلْمَانُ-

(৯) 'আবু জুহাইফাহ ওয়াহাব ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালমান ফারসী ও আবুদ দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করে দিয়েছিলেন। একদা সালমান (রাঃ) আবু দারদার বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। দেখলেন আবুদ দারদার স্ত্রী উম্মুদ দারদা জীর্ণবসন পরিহিতা। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উম্মুদ দারদা বললেন, আপনার ভাই আবুদ দারদার দুনিয়াবী কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে আবুদ দারদা এসে সালমান (রাঃ)-এর জন্য কিছু খাবার তৈরী করে নিয়ে আসলেন। সালমান (রাঃ) তার সাথে আবুদ দারদাকে খেতে বললেন। তিনি বললেন, আমি ছিয়াম রেখেছি। তখন সালমান (রাঃ) বললেন, 'তুমি না খেলে আমিও খাব না'। সুতরাং আবুদ দারদাও সালমানের সাথে খেলেন। রাতে আবুদ দারদা ছালাতের জন্য উঠলে সালমান (রাঃ) তাকে ঘুমাতে যেতে বললেন। তিনি ঘুমাতে গেলেন। রাতের শেষ প্রান্তে সালমান (রাঃ) আবুদ দারদাকে বললেন, এখন ওঠো। তখন দু'জনে ছালাত আদায় করলেন। পরে সালমান (রাঃ) আবুদ দারদাকে বললেন, তোমার উপর তোমার প্রভুর হক আছে, তোমার উপর তোমার আত্মার হক আছে, তোমার উপর পরিবারেরও হক আছে। সুতরাং প্রত্যেককে তার ন্যায্য অধিকার দাও। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, সালমান সত্য বলেছে' *(বুখারী হা/১৯৬৮)*।

١٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَي بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ. فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا. فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّيْ أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ وَلَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ-

(১০) 'আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিন ব্যক্তি রাসূলের স্ত্রীগণের নিকটে এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইল। তাদেরকে যখন ঐ সম্পর্কে বলা হ'ল, তারা যেন তা কম মনে করল। তখন তারা বলল, রাসূলের আমলের তুলনায় আমরা কোথায় পড়ে আছি? অথচ আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তাদের একজন বলল, আমি সর্বদা সারারাত ছালাত আদায় করব। আরেকজন বলল, আমি সারা বছর ছিয়াম পালন করব, কোন দিন ছাড়ব না। অন্যজন বলল, আমি নারীসঙ্গ ত্যাগ করব, কোন দিন বিবাহ করব না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে বললেন, তোমরা এরূপ এরূপ বলেছ? আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি। তথাপি আমি ছিয়াম পালন করি, ছেড়েও দেই, আমি ছালাত আদায় করি এবং ঘুমাই। আমি বিবাহও করেছি। সুতরাং যে আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করবে সে আমার দলভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫)*।

মনীষীদের বক্তব্য :

১. আবু সুলায়মান আল-খাত্তাবী বলেন, 'কোন কাজে তুমি বাড়াবাড়ি কর না, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। কাজের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থার উভয় দিক (অতিরঞ্জন ও সংকোচন) নিন্দনীয়' *(কুরতুবী ২০/৩৬৫)*।

২. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'সরল পথে চলা এবং বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যের মধ্যবর্তী হওয়া। আর মধ্যপন্থার মূল হচ্ছে সোজা পথে চলা' *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/২৩৮)*।

৩. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি লক্ষ দেরহাম সত্য-সঠিক কাজে ব্যয় করে সেটা অপব্যয় নয়। পক্ষান্তরে যে এক দিরহাম অন্যায় পথে ব্যয় করে সেটা হচ্ছে অপচয়। আর যে হকের পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে সে কৃপণতা করে' *(কুরতুবী ২০/৩৬৫; ফাতহুল ক্বাদীর ৫/৩৮৫)*।

সারবস্তু :

১. মধ্যপন্থা হ্রাস-বৃদ্ধি বা অতিরঞ্জন ও সংকোচনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।
২. মধ্যপন্থা সর্বদা বরকত ও কল্যাণের অভিসারী।
৩. মধ্যপন্থা জ্ঞানহীনের জ্ঞানের পূর্ণতা ও হেদায়াত প্রাপ্তির দলীল।
৪. মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নাজাতের অসীলা।
৫. প্রয়োজন ও দরিদ্রতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করে।
৬. শয়তানী পথের বিপরীত ছিরাতে মুস্তাক্বীম তথা সুপথের দিশা দেয়।

সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান

মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাকীম সালাফী
অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد :

ভূমিকা :

ইসলামী কৃষ্টি-কালচার টিকে থাকার ব্যাপারে মাদরাসা, মক্তব ও সাংবাদিকতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এজন্য ভারতের মুসলিম উম্মাহ ভারতে তাদের আগমনের সময় থেকেই ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে চিন্তান্বিত ছিলেন। প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্র এমন কিছু বান্দা মওজুদ ছিলেন, যারা তাদের গোটা জীবন ইসলামের খিদমতের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। বহু প্রতিকূল পরিস্থিতি সামনে এসেছিল, কিন্তু তারা হিম্মত না হারিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রতিরক্ষায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ও ব্যস্ত ছিলেন। ইসলামী মাদরাসাগুলির প্রতিষ্ঠা এবং পত্র-পত্রিকার প্রকাশ তারই একটা অংশ।

উপমহাদেশে আহলেহাদীছ জামা'আতের জ্ঞানগত, রাজনৈতিক, সংস্কারমূলক ও তাবলীগী খিদমত এদেশের এক আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়। এই জামা'আত একদিকে যেমন মুসলমানদের আক্বীদাগত ও জ্ঞানগত গোমরাহী অবসানের জন্য চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে তেমনি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। সাথে সাথে গ্রন্থ রচনা, শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে উপমহাদেশের জ্ঞান-গবেষণা আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেছে।

নিকট ও দূর অতীতের অবস্থার প্রতি আমরা যখন দৃষ্টিপাত করব তখন জানতে পারব যে, আমাদের পূর্বসুরীরা সাংবাদিকতার মাধ্যমে জাতীয়, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য কেমন দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের পর ১৮৫৭ সালে দেশের স্বাধীনতার সৈনিকরা যখন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হন, তখন সাংবাদিকতার মাধ্যমে পুরা ভারতবর্ষের জনগণের মাঝে স্বাধীনতার এমন রূহ ফুঁকে দেন যে, ভারতীয় জনগণ- চাই হিন্দু হৌক বা মুসলমান, মাথায় কাফন বেঁধে পথে নেমে আসে। এভাবে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহারের 'কমরেড', মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 'আল-হেলাল' ও 'আল-বালাগ', মাওলানা যা'ফর আলীর 'যমীনদার', আগা সুরেশ কাশ্মীরীর 'চাটান' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা সমগ্র ভারতবর্ষের বাশিন্দাদের হৃদয়ে দেশের স্বাধীনতার এমন স্পৃহা সৃষ্টি করে দিয়েছিল, যা ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিল। এ ব্যাপারে গোটা পৃথিবী অবগত আছে। এসব কীর্তি ঐসব পত্র-পত্রিকার অপরিসীম শক্তির নিদর্শন ছিল।

আহলেহাদীছ জামা'আত সালাফী মাসলাকের যিম্মাদার। প্রত্যেক যুগে তারা সঠিকভাবে ইসলামী আক্বীদা ও ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আসছে। বর্তমানে আমরা দেখছি যে, সাংবাদিকতা, গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ জামা'আতের নিকট ঐ মানদণ্ড এখন মওজুদ নেই (যা পূর্বে ছিল)।

একটা সময় ছিল যখন শায়খুল ইসলাম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এর 'আখবারে আহলেহাদীছ' পত্রিকা হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের আল-হেলাল, আল-বালাগ এবং মাওলানা আব্দুল হালীম শারারের 'দিলগুদায' পত্রিকার স্রোতধারা (প্রচার-প্রসার) ঝর্ণাধারা থেকে অগ্রগামী ছিল। বর্তমানে আমাদের সাংবাদিকতা অনেক সীমিত হয়ে গেছে। অথচ আহলেহাদীছ জামা'আতে পত্র-পত্রিকার কমতি নেই।

বাস্তবতা এই যে, যখন খালেছ নিয়ত এবং আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত করার জন্য প্রবন্ধমালা লেখা হয়, তখন সেসব প্রবন্ধের একটা আলাদা মানদণ্ড থাকে। সেগুলোর মান-মর্যাদা সর্বদা অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু যখন এই অনুভূতি হারিয়ে যায় তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসব প্রবন্ধের কোন মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে না।

১৯৬৩ সালে যখন জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস (মারকাযী দারুল উলূম) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন তার অন্যতম একটা উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, নিজেদের হিন্দুস্তানী পূর্বসুরীদের কীর্তিগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। এজন্য ১৯৮০ সালে 'মুতামারুদ দাওয়াহ ওয়াত তা'লীম' (দাওয়াত ও শিক্ষা সম্মেলন) নামে জামে'আ একটি আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্সের ঘোষণা দেয়। সাথে সাথে এ উপলক্ষে শিক্ষকতায়, গ্রন্থ রচনায়, প্রচার ও সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান সংকলন করার মনস্থও করে এবং জামে'আর কতিপয় শিক্ষককে তা সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করে। জামে'আর শিক্ষক মাওলানা আযীযুর রহমান সালাফীকে শিক্ষকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান এবং আমাকে গ্রন্থ রচনায় অবদান লেখার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আমরা দু'জন শিক্ষকতার পাশাপাশি নিজ নিজ কাজে লেগে যাই। মাওলানা আযীযুর রহমান শিক্ষকতায় অবদান সম্পন্ন করে জামে'আর কাছে জমা দেন।

গ্রন্থ রচনায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান লিপিবদ্ধ করার জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রন্থাগারগুলোতে গেলে আমাদের পূর্বসুরীদের প্রকাশিত কিছু পত্র-পত্রিকাও আমি পাই। যার ফলে আমি ভাবি যে, এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। এজন্য গ্রন্থ রচনায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদানের সাথে সাথে সাংবাদিকতায় অবদানও লিপিবদ্ধ করতে থাকব। যাতে আগামী প্রজন্ম এটা জানতে পারে যে, আমাদের

পূর্বসুরীরা জনগণের দোরগোড়ায় ইসলামের শিক্ষাসমূহ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কেমন চেষ্টা ও মেহনত করেছেন।

সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান লিপিবদ্ধ করার সময় আমি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছি।

১. পত্র-পত্রিকার প্রকাশকাল এবং সম্পাদকমণ্ডলীর নাম। যদি কোন কারণে সম্পাদক পরিবর্তন হন তাহলে বিস্তারিতভাবে তা উল্লেখ করা। অতঃপর প্রত্যেক পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও পর্যালোচনা পেশ করা।

২. সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পত্র-পত্রিকাগুলোকে বিভক্ত করা। যেসব পত্র-পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলোকে পুরাতন এবং যেগুলো চালু আছে সেগুলোকে নতুন শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অংশকে তার বিষয়বস্তুর দিক থেকে ৬ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রকার ভ্রান্ত ধর্মগুলোর খণ্ডন, দ্বিতীয় প্রকার শিরক, বিদ'আত ও তাক্বলীদে শাখছীর খণ্ডন, তৃতীয় প্রকার সাহিত্য ও ইতিহাস, চতুর্থ প্রকার সাহিত্য, রাজনীতি ও চরিত্র সংশোধন, পঞ্চম প্রকার ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও নৈতিক, ষষ্ঠ প্রকার আল্লাহ্র পথে জিহাদ।

এই বইয়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য গ্রন্থ রচনায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি আমাকে বহুবার পাক-ভারতের মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যক্তিগত লাইব্রেরীগুলোতে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে এবং পত্র-পত্রিকাগুলোর পাতা উল্টিয়ে দেখতে হয়েছে। এরপরেও এ বিষয়ে এ গ্রন্থের মর্যাদা প্রথম খণ্ডের মতো। এখনো বহু আহলেহাদীছ আলেমের পত্র-পত্রিকা ছুটে যাচ্ছে। যেটা আমি অনুভব করছি। কিন্তু সেগুলো অনুসন্ধান করা অসম্ভব। কেননা আহলেহাদীছ জামা'আতের নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা বের হতে থাকবে।

এ বইটি আপনাদের সামনে আছে। আমার যোগ্যতা সম্পর্কে আমি অবগত আছি। ভুল-ত্রুটি মানুষের স্বভাবজাত। পাঠকবৃন্দের কাছে আরয হ'ল, বইয়ে কোন ভুলচুক দৃষ্টিগোচর হলে জানাবেন। কৃতজ্ঞ থাকব।

আহলেহাদীছ জামা'আত এবং সাংবাদিকতা

(পুরাতন ও নতুন পত্র-পত্রিকা সমূহ) :

শিক্ষকতায়, গ্রন্থ রচনায় এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে আমাদের আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান যেমন অন্যান্য জামা'আতগুলোর তুলনায় বেশী, তেমনি সাংবাদিকতায় অবদানও কারো চেয়ে কম নয়। আমার জানা মতে এসব পত্র-পত্রিকার ৯৯টি পুরাতন এবং ৫০টি নতুন। এগুলি সময়ের বিবেচনায় প্রবন্ধমালা প্রকাশ এবং শিরক, বিদ'আত ও বাতিল ধর্মগুলোর মূলোৎপাটন করে আসছে। আপনাদের নিকট ঐ সকল পত্র-পত্রিকার নামসমূহ, প্রকাশনা স্থান, সম্পাদকমণ্ডলী, প্রকাশকাল এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লেখ করার পূর্বে তার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি।

প্রেক্ষাপট :

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পুরা ভারতবর্ষকে পুরাপুরি কব্জা করে নেয়, দেশের মুজাহিদদেরকে নির্মূল করতে সফলতা অর্জন করে এবং নিশ্চিন্তভাবে দেশ শাসন করতে শুরু করে, তখন তাদের শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, টাকা-পয়সা ব্যয় সহ সকল উপায় অবলম্বন করে এখানকার বাশিন্দাদেরকে বিশেষ করে যুবকদেরকে খ্রিষ্টান ধর্মের দাওয়াত দিতে হবে। এই পরিকল্পনার আলোকে তারা হিন্দুস্তানে পাদ্রী ও সুন্দরীদের ফাঁদ পাতে। এবার খ্রিষ্টানদের ধোঁকা, টাকা-পয়সার লোভ এবং সুন্দরী খ্রিষ্টান যুবতীদের সঙ্গ হিন্দুস্তানের যুবসমাজের উপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব ফেলে। তাদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। অর্থ ও সুন্দরী ললনাদের নিকট সস্তায় বিক্রি হওয়া অনেক যুবক ও মোল্লা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে তার প্রচারে নেমে পড়ে। এমন নাযুক সময়ে আহলেহাদীছ জামা'আতের এক কনফারেন্সে শায়খ গোলাম মহিউদ্দীন (কাছূরের উকিল, যেলা লাহোর) সকল আলেমকে বিশেষ করে আহলেহাদীছ আলেমদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'এখন ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের মুকাবিলা চলছে। পাদ্রীদের আশংকা রয়েছে যে, কুরআন যদি উন্নতি করে ফেলে তাহলে মাসীহ-এর পুত্র ও উপাস্য হওয়া হোঁচট খাবে। এজন্য খ্রিষ্টানরা প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু আমরা মুসলমান হয়েও নিদ্রাবিভোর হয়ে আছি। এখন পাঁচশ খ্রিষ্টান মহিলা প্রচারের কাজ করছে। পুরুষদের কথা বাদই দিলাম'।[১]

> যখন খালেছ নিয়ত এবং আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত করার জন্য প্রবন্ধমালা লেখা হয়, তখন সেসব প্রবন্ধের একটা আলাদা মানদণ্ড থাকে। সেগুলোর মান-মর্যাদা সর্বদা অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু যখন এই অনুভূতি হারিয়ে যায় তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসব প্রবন্ধের কোন মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে না।

এ বক্তব্যের ফলে আহলেহাদীছ আলেমদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয় এবং তারা কোমর বেঁধে সাহসের সাথে ময়দানে নেমে পড়েন। নিজেদের বক্তব্য ও লেখনী এবং বই ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে ধাবমান এই স্রোতকে বাধা দিতে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে খ্রিষ্টানদের রাজপ্রাসাদে ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। এ বিষয়ে আফসোস করে কলকাতার সিভিল সার্ভিস পুলিশ কমিশনার এইচ.জে. কাটন

১. *রোয়েদাদে কনফারেন্স অমৃতসর বা অমৃতসর কনফারেন্সের রিপোর্ট।*

Contents

তার New India গ্রন্থে লিখেছেন যে, ‘যেখানে কোন সুন্দর ধর্মীয় আলোচনা হ’ত সেখানে খ্রিষ্টান ধর্ম খ্রিষ্টান বানাতে ব্যর্থ হ’ত এবং সংখ্যা বেশী বাড়াতে পারত না’।[২]

ইংরেজরা যখন তাদের এই মিশনে ব্যর্থ হ’ল, তখন দ্বিতীয় অস্ত্র এটা ব্যবহার করল যে, কতিপয় ঈমান বিক্রেতা আলেমকে তৈরী করে কিছু মাযহাবী ঝগড়া দাঁড় করিয়ে দিল। যেমন ব্রেলভী, কাদিয়ানী, বাহাঈ এবং প্রকৃতিবাদী জাতীয় ফিরকাগুলো মুসলমানদের মধ্যে জোরেশোরে উঠে দাঁড়াল এবং সাথে সাথে আর্য ধর্মও মাথাচাড়া দিল। এমন নাযুক সময়ে আহলেহাদীছ আলেমগণ পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শুধু ওয়ায-নছীহত, বই, প্রচারপত্র এবং অন্যদের পত্র-পত্রিকার উপর নির্ভর করে ধর্মহীনতার এই স্রোতকে রোখা সম্ভব হবে না। নিজেদের এবং নিজেদের জামা‘আতেরও পত্র-পত্রিকা থাকা দরকার।

অতএব দ্রুত আল্লামা আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী (১৮৪১-১৯২০) ‘ইশা‘আতুস সুন্নাহ’ নামে একটি মাসিক এবং মোল্লা মুহাম্মাদ বখশ লাহোরী ‘জা‘ফর যেটলী’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মোল্লা বখশ লাহোরী যখন তাঁর উক্ত পত্রিকাকে প্রকৃতিবাদী (নাস্তিক)দের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন, তখন শায়খুল ইসলাম আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ‘মুসলমান’ নামে একটি মাসিক এবং ‘আখবারে আহলেহাদীছ’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করে দেন। অতঃপর প্রয়োজন অনুপাতে অন্যান্য পত্র-পত্রিকা বের হ’তে থাকে। এবার আহলেহাদীছ আলেমগণ পরিপূর্ণরূপে তাদের ওয়ায-নছীহত, বাহাছ-মুনাযারা, বই ও প্রচারপত্র এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামের দুশমনদের মুকাবিলায় বুকটান করে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তাদের সকল হামলা পিছিয়ে দিয়ে অধিকাংশ মুসলমানকে গোমরাহী থেকে মুক্তি দেন। যার উপর কেবল বিভিন্ন ঘরানার ইসলামী চিন্তাবিদরাই নন; বরং আর্য সমাজের একজন পণ্ডিতও প্রশংসা না করে পারেননি।

উদাহরণস্বরূপ শুধু ‘আখবারে আহলেহাদীছ’-এর সম্পাদক শায়খুল ইসলাম আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সম্পর্কে আহলেহাদীছ নন এমন দু’জন ইসলামী চিন্তাবিদ এবং একজন আর্য সমাজনেতার উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে পেশ করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি।

اسلامی قانون ہی خطرناک جرائم کا تریاق ہے

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সম্পাদিত ‘আখবারে আহলেহাদীছ’-এর নমুনা

(১) কাযী মুহাম্মাদ আদীল আব্বাসী এডভোকেট বাস্তী লিখেছেন যে, ‘পঞ্চান্ন বছরের বেশী হয়েছে। আমার তরুণ বয়সে যখন আমি সরকারী হাইস্কুল বাস্তীতে পড়াশুনা করছিলাম। এমন সময় আর্য সমাজের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে জোরেশোরে সমালোচনার বজ্রবৃষ্টি শুরু হয়। মনে হ’ত কোন শত্রু পুরাপুরি অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ইসলামের দুর্গে এমনভাবে গোলা বর্ষণ শুরু করে দিয়েছে যে, এখন তার বাঁচা যাবে না। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দজী একজন পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ ছিলেন। তিনি বিয়ে করেননি। হিন্দু ধর্মের পরিভাষায় তিনি বাল ব্রহ্মচারী ছিলেন। এজন্য তার গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল। তিনি ‘বেদ’কে প্রথম ও শেষ ঐশীবাণী আখ্যা দিয়ে মূর্তিপূজাকে ভুল আখ্যা দেন এবং একত্ববাদের ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তিনি হিন্দুদের ধর্মীয় পুস্তকগুলোকে অস্বীকার করেন এবং শ্রী সীতারাম ও কৃষ্ণ মহারাজকে ছেড়ে ‘ওম’ (আল্লাহ)-এর ডংকা বাজান। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়কে ইবাদতের সময় বলে আখ্যা দেন। মূর্তিবিহীন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় পূজার (سندھیا) পদ্ধতি বাৎলিয়ে দেন। অর্থাৎ হাঁটু গেড়ে বসে যান এবং ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। আসলে ইসলামের বিপরীতে এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ রীতি ছিল এবং প্রত্যেকটি পদক্ষেপে ইসলামের বিরোধিতা উদ্দেশ্য ছিল। নিজ ধর্মে এই নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ইসলামকে ধ্বংসের দিকে মুখ ফিরান এবং ‘বিসমিল্লাহ’ থেকে ‘ওয়ান্নাস’ পর্যন্ত গোটা কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি নিজ দলের মধ্যে এমন জোশ সৃষ্টি করে দেন যে, তাদের মধ্যে বিজয় ও বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়। স্বামীজীর অভিযোগগুলো অগভীর ছিল না। বরং সেগুলোর মধ্যে গভীরতা ছিল। তিনি সর্বদা নিজেও গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিলেন। ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করতেন। এর মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, তিনি মুসলমান যুবকদের মনে সন্দেহকে ঘনীভূত করে দিবেন। তিনি নিজ থেকে প্রত্যেকটি কথা চিন্তা-ভাবনা করে মন-মগজের উপর হামলাকারী ছিলেন। হামলা এমন অকস্মাৎ এবং জোরেশোরে ছিল যে, মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। অবস্থাদৃষ্টে এমন মনে হচ্ছিল যে, ইসলামের দুর্গের খুঁটিগুলি এই ঝড়ের মুকাবিলা করতে পারবে না এবং উপড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। বস্তুতঃ

২. *New India (London : 1885), p.155.*

নতুন হিন্দু ধর্মকে তিনি সংস্কারকের ধাঁচে যে সুসংবদ্ধ করেছিলেন, তার মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা সমূহ সবই ছিল ইসলাম থেকেই নেওয়া।

মাওলানা ছানাউল্লাহ্র আবির্ভাব :

হৃদস্পন্দন রহিতকারী এই ভূমিকম্পসদৃশ অবস্থায় একজন মর্দে মুজাহিদের আবির্ভাব ঘটে। যিনি সামগ্রিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আলেম, গভীর জ্ঞানের অধিকারী, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, বাগ্মী, তার্কিক, গবেষক, চিন্তাবিদ, লৌহ মানব, দৃঢ় বিশ্বাসের প্রচারক এবং দৃঢ় চিত্তের বার্তাবাহক।

اگر ہو رزم تو شیران غاب کے مانند

دگر ہو بزم تو رعنا غزال تاتاری

কবি বলেন,

যদি হয় যুদ্ধ তবে বনের সিংহের মতো
আর যদি হয় মজলিস, তবে চঞ্চল তাতারী হরিণের মতো।

তিনি ঘৃণার জবাব ভালবাসার মাধ্যমে, হাসি-ঠাট্টার জবাব গাম্ভীর্যের মাধ্যমে, ক্রোধের জবাব মুচকি হাসির মাধ্যমে এবং জটিল প্রশ্নের জবাব প্রমাণপঞ্জিসহ এমনভাবে দেন যে, প্রতিটি পদক্ষেপে সবদিক থেকে আওয়ায আসতে থাকে-

چوں بشنوی سخن اہل دل مگو کہ خطاست

سخن شناس نئی دلبرا خطایں جاست

কবি বলেন,

যখনই বিষ্ণুভক্ত বলবে না যে, এটি ভুল,

তখনই বাক্যদর্শী নতুন প্রেমিক বলবে যে, ভুল তো এখানেই!

ইনি ছিলেন যুগ সংস্কারক, মহান মুবাল্লিগ, বড় মুহাক্কিক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (আল্লাহ তাঁর কবরকে আলোকিত করুন)। এ যুগের নতুন মুসলিম বংশধরদের প্রতি তাঁর ইহসান অপরিসীম। আজ আমরা যদি এই ধরাধামে ঈমান ও ইয়াক্বীনের (দৃঢ় বিশ্বাস) দ্বারা সৌভাগ্যবান হয়ে থাকি, তাহ'লে এটা সেই মর্দে মুজাহিদের অসীলায়। আগামী বংশধরগণের উপর তাঁর ইহসান যথারীতি বাকী আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে।

ইসলামের এই সিপাহসালার যখন যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন তাঁর চারপাশে খ্যাতিমান আলেমগণ দলে দলে একত্রিত হয়ে গেলেন...। 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এর[৩] জবাব 'হক প্রকাশ' একটি এ্যাটম বোমা ছিল। যেটি সকল সমালোচনাকে ধোঁয়ার মত উড়িয়ে দিল। আমি এমন দিনও দেখেছি যখন আর্য সমাজভুক্ত আমার সহপাঠীরা ইংরেজী ভাষায় আমাদেরকে বলত, 'নিজ (হিন্দু) ধর্ম ত্যাগ কর। এতে কোন সত্যতা নেই'। আর এটাও দেখেছি যে, মৌলভী মুহাম্মাদ ওমর একটি টুল হাতে নিয়ে এবং বাজারে তার উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে আহবান জানাতেন, এসো মুনাযারা কর। তিনি এটাও বলতেন যে, দিওরিয়া মুনাযারার পরে (যেই বিশাল রণক্ষেত্রের বীর যোদ্ধা ছিলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ) আশা ছিল না যে, আর্য সমাজ পুনরায় ময়দানে আবির্ভূত হবে। অথচ বর্তমানে এমন অবস্থা যে, মুসলমান বাচ্চাদেরকে বলা হয়, 'নিজ ধর্ম ত্যাগ কর। এতে কোন সত্যতা নেই'।

ফলকথা এই যে, এভাবে সারা ভারতবর্ষ ঈমান ও ইয়াক্বীনের আলোতে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠে। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, তা মনে প্রভাব বিস্তার করত। যুক্তিপূর্ণ দলীলসমূহ এত মযবূত হত যে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকত না। মাওলানা শুধু আহলেহাদীছদের ছিলেন না; বরং তিনি পুরা মুসলিম মিল্লাতের (সম্পদ) ছিলেন'।[৪]

(২) মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (১৮৯২-১৯৭৭) লিখেছেন যে, 'আমি ঐ সময় মাওলানার নাম জেনেছিলাম যখন এক মুরতাদের বই 'তারকে ইসলাম' (ইসলাম ত্যাগ)-এর কারণে আমার অন্তর অত্যন্ত দগ্ধীভূত ছিল। স্বল্প সময়ে 'তুরকে ইসলাম' (ইসলামের সৈনিক) নামে মাওলানা তার জবাব লিখেছিলেন। সৈনিকের জবাবে মুরতাদ তখনই শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং অবশেষে নতুনভাবে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।[৫] আমি তখন স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম এবং বয়স ১১ বছরের বেশী ছিল না। এক হিন্দু ছেলের কাছ থেকে 'তারকে ইসলাম' নিয়ে এক ঝলক দেখে নিয়েছিলাম এবং এতে সমস্ত শরীরে আগুন ধরে গিয়েছিল। কিছুদিন পরেই 'তুরকে ইসলাম' দেখার সৌভাগ্য হয় এবং

---

৩. বাংলাদেশের কৃতীসন্তান মুন্সী মেহেরুল্লাহ (যশোর) উক্ত গ্রন্থের জবাবে 'হিন্দু ধর্ম রহস্য' ও 'বিধবা গঞ্জনা' নামে দু'টি গ্রন্থ লিখেছিলেন (মুহিউদ্দীন খান, জীবনের খেলা ঘরে (আত্মজীবনী) (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ৫ম সংস্করণ, ২০১৪), পৃঃ ৭০।- অনুবাদক।

৪. আখবারে আহলেহাদীছ, ২১শে নভেম্বর ১৯৭১।

৫. আব্দুল গফূর নামে এক ব্যক্তি মাহবুবে আলম ইসলামিয়া হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তার সাথে আর্য সমাজের এক মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। মেয়েটি তাকে বলে, আমি আর্য সমাজী আর তুমি মুসলমান। এমতাবস্থায় তোমার ও আমার সম্পর্ক কিভাবে চলতে পারে? ফলে মাস্টার ছাহেব ইসলাম ধর্ম ত্যাগের ঘোষণা দেন। সে সময় আর্যদের স্কুল ছিল গোরকল। বর্তমানে এটি ইকবাল হাইস্কুল নামে পরিচিত। সেখানে গিয়ে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করেন। আর্য সমাজীরা মাস্টার ছাহেবের নাম আব্দুল গফূরের পরিবর্তে ধর্মপাল রেখে দেয়। এতে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ ধূমায়িত হলে আর্যসমাজীরা ধর্মপালকে গুজরানওয়ালা (পাকিস্তান) থেকে লুধিয়ানায় পাঠিয়ে দেয়। সেখানে গিয়ে তিনি 'তারকে ইসলাম' (ইসলাম ত্যাগ) নামে একটি বই লিখেন। এর জবাবে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী 'তুরকে ইসলাম' (ইসলামের সৈনিক) শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর প্রচেষ্টা ও সুন্দর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে ধর্মপাল পুনরায় মুসলমান হন। এবার তার নাম রাখা হয় গাযী মাহমূদ। হাজীপুরা মহল্লার লোকজন গাযী মাহমূদকে পুনরায় গুজরানওয়ালায় বাবু আতা মুহাম্মাদ ছাহেবের বাংলোতে অনুষ্ঠিত জালসায় দাওয়াত দেয়। তিনি সেখানে আর্য সমাজের বিরুদ্ধে এবং ইসলামের পক্ষে লা-জওয়াব বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত জালসার সভাপতি ছিলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (আবুল বাশীর আব্দুল্লাহ, তারীখে আহলেহাদীছ (শহর গুজরানওয়ালা), (লাহোর : উমনী প্রিন্টার্স, ১৪০১ হিঃ/১৯৮০ খৃঃ), পৃঃ ১০-১৩)।- অনুবাদক।

এটি ক্ষতের উপরে ঠাণ্ডা মলম লাগিয়ে দেয়। এটা ১৯০২ বা ১৯০৩ সালের গোড়ার দিকের কথা। তখন থেকেই আমার মন মাওলানার অত্যন্ত ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর লেখনী এই ভক্তি বৃদ্ধি করতেই থাকে। তাঁর সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ'ও কিছুদিন পরে পড়া শুরু করে দেই। আক্বীদাগত গোঁড়ামিতে বহু বছর পর মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছিল। মাওলানার উর্দূ তাফসীরও সংক্ষিপ্ত তাফসীরগুলোর মধ্যে ভাল। কিন্তু আরবী তাফসীরের মর্যাদা এর চেয়ে বেশী। এতে তিনি কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়েই করেছেন। একই মর্মের আয়াতগুলি সুন্দরভাবে একই স্থানে পাওয়া যায়। মুনাযারা শিল্পের তো বলা চলে তিনি ইমাম ছিলেন। বিশেষ করে আর্য সমাজের অনুসারীদের মুকাবিলায়। যারা মন্দ বুঝ ও জ্ঞানহীনতার পাশাপাশি গালমন্দকারীও ছিল। বিংশ শতকের শুরুতে তাদের ফিৎনা সে সময়ের সবচেয়ে বড় ফিৎনা ছিল। যদি মাওলানা ছানাউল্লাহ তাদের সামনে না আসতেন, তাহলে আল্লাহ জানেন মুসলমানদের উপর ভর করা ভয়-ভীতি কতদূর গিয়ে ঠেকত। প্রতিপক্ষের নাড়ি-নক্ষত্র জানার ব্যাপারে মাওলানা অনেক অগ্রগামী ছিলেন। এমন কথা খুঁজে বের করতেন যে, আর্য সমাজীরা দিশেহারা হয়ে যেত। কত যে মুনাযারা করেছেন[৬] এখন তা মনে নেই। সব জায়গায় তিনি বিজয়ীই থাকতেন।

এক জায়গায় আর্য সমাজের এক খ্যাতিমান তার্কিক বিতর্কের শুরুতেই উরুতে হাত মেরে বলে ফেলেন যে, 'আপনি মুসলমানই বা কখন হ'লেন যে ইসলামের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন। মুসলমান আলেমদের ফৎওয়াগুলি দেখুন! এগুলি সব আপনাকে কাফের সাব্যস্ত করার ব্যাপারে'। এ কথা বলে টেবিলের ওপরে ঐ ফৎওয়াগুলোর গাদা বিছিয়ে দেন। মাওলানা ধৈর্যের সাথে নিজের কাফের হওয়ার ডুগডুগি শুনতে থাকেন। অতঃপর তিনি কথা শেষ করার সাথে সাথে মাওলানা জোরে বলে ওঠেন, 'ঠিক আছে জনাব! আমি এখন মুসলমান হচ্ছি। আপনারা সব মুসলমান সাক্ষী থাকেন যে, আমি আপনাদের সবার সামনে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করছি, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল'। এখন বলুন, আর তো কোন অজুহাত বাকী থাকল না। মুসলমানরা খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেল। আর্য তার্কিকের পক্ষ থেকে আর কোন উত্তর এল না। এরপর মাওলানা নিজের কাজ শুরু করে দিলেন।

তিনি খ্রিষ্টানদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকতেন। সে সময়টাও ছিল বাহাছ-মুনাযারার। আর্য সমাজের লোকেরা খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়া শিখেছিল। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই খ্রিষ্টান মিশনারীরা মুসলমানদের পিছে লেগেছিল। খ্রিষ্টানদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য মাওলানা সম্ভবতঃ কিছু ইংরেজীও শিখে নিয়েছিলেন। যদি ইংরেজী আরেকটু বেশী অধ্যয়ন করতেন তাহলে স্বীয় শিল্পে অতুলনীয় হয়ে যেতেন। কালেমা পাঠকারী ফিরকাগুলোর মধ্যে আহমাদিয়াদের (কাদিয়ানী) দিকে মনোযোগ থাকত বেশী । এমনকি একবার তো পুরস্কার ঘোষিত এক বিতর্কে কাদিয়ানী প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট থেকে পুরস্কারও জিতেছিলেন'।[৭]

(৩) আর্য পণ্ডিত ধর্মপাল লিখেছেন যে,

'যখন মৌলভী নূরুদ্দীন কাদিয়ানী 'নূরুদ্দীন' নামক বইয়ের মাধ্যমে এবং মৌলভী ছানাউল্লাহ ছাহেব 'তুরকে ইসলাম' নামক বইয়ের মাধ্যমে ইসলাম ও মোল্লাইযমের (ব্যক্তির মত বা আলেমদের তাক্বলীদ) মধ্যে পার্থক্য রেখা টেনে দেন, তখন আমার রচনাবলীর মূল্য একটা দিয়াশলাই-এর মতো থেকে যায়। আমার অভিযোগগুলোর জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে 'নূরুদ্দীন'-এর লেখকের নিশানা ইলমী তথ্যাবলীর কারণে নির্ভুল হত। কিন্তু 'তুরকে ইসলাম'-এর আঘাত আমাকে বেশী কষ্ট দিত। আমি প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে তাফসীরের ভিতের উপর যে দুর্গ নির্মাণ করতাম, তিনি স্রেফ এ বাক্যটুকু বলেই তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতেন যে, 'তাফসীরের জওয়াব তাফসীর লেখকদের কাছ থেকে নাও। কুরআন মাজীদ এর যিম্মাদার নয়'। এই একটিমাত্র বাক্য আমার 'তারকে ইসলাম' ও আমার অন্য আরেকটি রচনা 'তাহযীবুল ইসলাম'-কে চালুনি করে দেয় এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে, 'নূরুদ্দীন'-এর লেখকের সাথে বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু 'তুরকে ইসলাম'-এর লেখকের সাথে বিতর্ক চলা মুশকিল। যিনি মোল্লাইযমকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারকারী। মজার ব্যাপার হ'ল 'নূরুদ্দীন'-এর লেখক আমার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার কলম ধরেননি। অথচ আমি আশা করেছিলাম যে, তার সাথে বিতর্ক অব্যাহত থাকুক। কিন্তু 'তুরকে ইসলাম'-এর লেখক 'তাহযীবুল ইসলাম'-এর জবাবে আবার কলম ধরেন। তখন আমি 'তুরকে ইসলাম'-এর লেখকের মুকাবিলায় পুনরায় কলম ধরতে অস্বীকার করি। এভাবে আমাদের প্রথম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে'।[৮]

'আমার গত এক বছরের কাউকে কষ্ট না দেয়া জীবন আমার মুসলমান ভাইদের মনেও আমার জন্য এমন মহব্বত সৃষ্টি করে দেয় যে, যখন তারা আমার অসুস্থতার কথা জানে তখন তারা দলে দলে আমার কাছে আসতে শুরু করে। তন্মধ্যে মৌলভী ছানাউল্লাহ ছাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৌলভী ছাহেবের সাথে লিখিত যুদ্ধ তো বছরের পর বছর চলতে থাকত। কিন্তু মুখোমুখি হওয়ার সম্ভবতঃ এটাই প্রথম সুযোগ ছিল। যেটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগই বলতে হবে। যদিও সেটা অসুস্থ অবস্থায় এসেছিল।

---

৬. মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী পঞ্চাশের অধিক মুনাযারা করেছেন (পাক্ষিক তারজুমান, দিল্লী, ৩৬/২০ সংখ্যা, ১৬-৩১শে অক্টোবর, ২০১৬, পৃঃ ২৬) ।-অনুবাদক।

৭. মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, মু'আছিরীন (কলকাতা : কোহে নূর আর্ট প্রেস), ১২৪ পৃঃ।

৮. আল-মুসলিম, ডিসেম্বর ১৯১৪, পৃঃ ৩৯৩।

মৌলভী ছাহেব স্বভাবগতভাবে রসিক মানুষ। এজন্য বুঝতে হবে যে, একদিকে যেমন তারকে ইসলাম, তাহযীবুল ইসলাম বরং নাখলে ইসলাম-এর লেখক বিছানায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, অন্যদিকে তেমন তুরকে ইসলাম, তাগলীবুল ইসলাম (৪ খণ্ড) বরং তিবরে ইসলাম (ইসলামের কুঠার)-এর লেখক তার বালিশের পাশে বসে তার সেবা-শুশ্রূষা করছেন। সেখানে যদি আকাশ ও যমীনের ফেরেশতামণ্ডলী আনন্দচিত্তে নিম্নোক্ত কবিতা পড়তে থাকেন, তাহ'লে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

شکر ایزدکہ میان من داد صلح فتاد

حوریاں رقص کناں ساغر شکرانہ زدند

কবির কথায়-

আল্লাহ্র শোকর যে, আমার মধ্যে সন্ধির ফরিয়াদ এসে গেছে

মদের পেয়ালা নিয়ে হুর-পরীগণ শুকরিয়ার নাচ নাচছে।

ইতিপূর্বে আমার এরূপ ধারণা ছিল যে, মৌলভী ছানাউল্লাহ, যিনি আহমাদিয়া ফিরকার সাথে মোল্লাদের মতো ঝগড়াঝাটি করে থাকেন, তিনি নিজেও কোন কাটমোল্লা হবেন। এ কারণে তাঁর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমি কখনো তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইতাম না। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই জেনে যাই যে, মৌলভী ছানাউল্লাহ একজন খোশ মেযাজী, রসিক, সুন্দর এবং চরিত্রবান ভদ্র মানুষ (Gentleman)। আল্লাহ তাকে একটা চিত্তাকর্ষক স্টাইল দিয়েছিলেন। সত্য তো এটাই যে, এই 'ইয়াকুব পুত্র'কে দেখে আমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেশ সময় লেগে যায়। মৌলভী ছানাউল্লাহ প্রতি তিনদিন পর আমার খবর নেয়ার জন্য লাহোর আসতেন'।[৯]

'কিছুদিন পর আমার আবার মোল্লাইযমকে উসকানোর চিন্তা মাথায় আসে। এবার আমি ইতিহাসের বই সমূহের সাহায্য নেই এবং 'নাখলে ইসলাম' নামে বিদ্রুপাত্মক একটি বই প্রকাশ করি। আর্য সমাজের পত্রিকাগুলো অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এই বইয়ের পর্যালোচনা করে এবং মুসলিম পত্রিকাগুলো এর বিরুদ্ধে হৈচৈ ফেলে দেয়। আমি চাচ্ছিলাম যে, পুরানো ধ্যান-ধারণার মোল্লা টাইপের মানুষ আমার মুকাবিলায় আসুক। যাতে আমার এ কথা জানার সুযোগ হয় যে, তারা ঐ সকল বক্তব্যের কি উত্তর দেয়। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এবারও ঐ 'তুরকে শীরাযী' (শীরাযের বীর সৈনিক) একথা বলে জবাব দেন যে, 'কুরআন মাজীদ বা ইসলাম কোন ইতিহাস বা তাফসীরের জবাব দানকারী নয়'।

'নাখলে ইসলাম' (ইসলামের খর্জুর বৃক্ষ)-কে (আমার আরেকটি বইয়ের নাম) 'তিবরে ইসলাম' (মাওলানার পক্ষ থেকে তার জবাব) আঘাত করতে থাকে। এভাবে পুরানো ধ্যান-ধারণার যেসব মোল্লাকে উসকানোর জন্য আমি এটা দ্বিতীয় চেষ্টা করেছিলাম, তারা পুনরায় বেঁচে যায়।

অবশেষে যখন আমি দেখলাম যে, মোল্লাইযম-এর অনুসারীরা তো ময়দানে আসে না এবং যে ময়দানে আসে সে মোল্লাইযমকে মানে না। তখন আমি ঐ সকল বির্তকের চূড়ান্ত ফায়ছালা করে ফেলি এবং 'তারকে ইসলাম' থেকে শুরু করে আমার সর্বশেষ রচনা পর্যন্ত যত বই ছিল সেগুলোকে আমি ১৯১১ সালের ১৪ই জুন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেই' (এবং নিজের মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দেই)।[১০] *(ক্রমশঃ)*

[লেখক : সাবেক শায়খুল জামে'আহ, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ভারত। অনুবাদক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এবং ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

৯. *আন্দার, ডিসেম্বর ১৯১২, পৃঃ ৯২। এটি গাযী মাহমূদের একটি মাসিক পত্রিকা ছিল।*

১০. *আল-মুসলিম, ডিসেম্বর ১৯১৪, পৃঃ ৩৯৩।*

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

সন্তান প্রতিপালন

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা :

সন্তান মানুষের জন্য মূল্যবান সম্পদ ও দুনিয়ার সৌন্দর্য স্বরূপ। এই অমূল্য সম্পদকে যেভাবে প্রতিপালন করা হবে সেভাবে গড়ে উঠবে। ছেলে-মেয়েকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুললে তারা দুনিয়াতে যেমন উপকারে আসবে তেমনি পিতামাতার জন্য তারা পরকালে মুক্তির কারণ হবে। জনৈক ব্যক্তিকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করা হ'লে সে অবাক হয়ে বলবে, এমন মর্যাদা কোন আমলের বিনিময়ে পেলাম? আমি তো এতো সৎআমল করেনি। বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের প্রার্থনার কারণেই তোমাকে এ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।[১] মানুষ মৃত্যুবরণ করলে সৎ সন্তানের দো'আ পিতা-মাতার উপকারে আসে।[২] নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি সন্তানদেরকও বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে রক্ষা কর *(তাহরীম ৬৬/৬)*। সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

মাতা-পিতার দায়িত্ব :

মা-বাবা হওয়া সহজ হ'লেও দায়িত্বশীল মাতা-পিতা হওয়া সহজ নয়। সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে না পারলে সন্তানের কারণে উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে। এজন্য ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি যথাযথভাবে সন্তান প্রতিপালন আবশ্যক করে দিয়েছে। পিতা-মাতা, অভিভাবক ও সমাজের দায়িত্বশীলদেরকে শিশু, কিশোর ও যুবকদের শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ে অবশ্যই আল্লাহ্র সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে। তারা যদি তাদের সুশিক্ষা দিয়ে থাকে, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে তারা নিজেরাও সফল হবে এবং নতুন প্রজন্মও সফল হবে। আর যদি তাদেরকে সুশিক্ষা দিতে অবহেলা করে, তাহ'লে তার পরিণতি উভয়কে ভোগ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসনকর্তা তার প্রজাদের সম্পর্কে, বাড়ীর মালিক তার পরিবার সম্পর্কে, স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও সন্তান সম্পর্কে এবং গোলাম (দাস) তার মালিকের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল ও প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৩]

তিনি আরো বলেন, وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّ 'তোমার উপর তোমার সন্তানেরও অধিকার রয়েছে'।[৪] তিনি বলেন, وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ 'তোমার পরিবারেরও তোমার প্রতি অধিকার রয়েছে। অতএব প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব প্রদান কর'।[৫] রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَسْتَرْعِى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْداً رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ إِلاَّ سَأَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْ أَضَاعَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে কম-বেশী কোন দায়িত্ব দেন তাকে সে বিষয়ে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন যে, সে তাদের মধ্যে আল্লাহ্র বিধান কায়েম করেছিল না বিনষ্ট করেছিল। অবশেষে তাকে তার পরিবার পরিজন সম্পর্কে বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করবেন।[৬] সুতরাং পিতা-মাতাকে সন্তান পালনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। এক্ষণে পিতা-মাতার করণীয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

(ক) সন্তানের জন্য প্রার্থনা করা

সন্তান জন্ম গ্রহণ করার পূর্বে সুসন্তান লাভের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে হবে। নবী-রাসূলগণ সুসন্তানের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেছেন। ইবরাহীম (আঃ) বৃদ্ধ বয়সে সন্তান প্রার্থনা করে বলেছিলেন, رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ 'হে আমার রব! আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান কর' *(ছাফ্ফাত ৩৭/১০০)*। যাকারিয়া (আঃ) সুসন্তান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করে বলেছিলেন, رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হ'তে একটি পূত-চরিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী' *(আলে ইমরান ৩/৩৮)*। মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা সন্তানদের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'আলা জন্য, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*। সন্তানের জন্য খারাপ দো'আ করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ

---

১. *আহমাদ হা/১০৬১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।*
২. *মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।*
৩. *বুখারী হা/২৭৫১; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।*
৪. *মুসলিম হা/১১৫৯।*
৫. *বুখারী হা/১৯৬৮; মিশকাত হা/২০৬১।*
৬. *আহমাদ হা/৪৬৩৭, সনদ ছহীহ।*

تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ ‘তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, নিজেদের সন্তান-সন্ততির বিরুদ্ধে, নিজেদের ধন-সম্পদের বিরুদ্ধে বদ দো‘আ কর না। কেননা, এমন হ’তে পারে যে, তোমরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন একটি সময় পেয়ে বস, যখন আল্লাহ্র কাছে যা প্রার্থনা করবে, তোমাদের জন্য তা কবূল করে নেবেন’।[৭]

(খ) শিশুর তাহনীক্ব করা :

‘তাহনীক’ অর্থ খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেওয়া। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)- এর কাছে শিশুদেরকে আনা হ’ত। তিনি তাদের জন্যে বরকত ও কল্যাণের দো‘আ করতেন এবং 'তাহনীক্ব (খেজুর চিবিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দিতেন) করতেন।[৮] হিজরতের পর মদীনায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির সন্তান আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে ‘তাহনীক’ করেছিলেন। আসমা বিনতু আবীবকর (রাঃ) বলেন, فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعْتُهُ فِى حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِى فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِى الإِسْلاَمِ ‘আমি এমন সময় হিজরত করি যখন আমি আসন্ন প্রসবা। আমি মদীনায় এসে কুবাতে অবতরণ করি। এ কুবায়ই আমি পুত্র সন্তানটি প্রসব করি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে তাঁর কোলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনালেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। কাজেই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি আব্দুল্লাহর পেটে গেল তা হ’ল নবী করীম (ছাঃ)-এর মুখের লালা। রাসূল (ছাঃ) সামান্য চিবান খেজুর নবজাতকের মুখের ভিতরের তালুর অংশে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তার জন্য দো‘আ করলেন এবং বরকত চাইলেন। তিনি হ’লেন প্রথম নবজাতক যিনি হিজরতের পর মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেন’।[৯] আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, وُلِدَ لِى غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَىَّ ‘আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মালে আমি তাকে নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইব্রাহীম। তারপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দো‘আ করলেন অতঃপর আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।[১০] আবু ত্বালহা (রাঃ) তার সদ্যজাত পুত্রকে এনে রাসূল (ছাঃ)-এর কোলে দিলে তিনি খেজুর তলব করেন। অতঃপর তিনি তা চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেন ও নাম রাখেন ‘আব্দুল্লাহ’।[১১]

কোন কোন বিদ্বান এটিকে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের আমল দ্বারা তাহনীক করানোর বিষয়টি প্রমাণিত।[১২] ইমাম নববী বলেন, শিশুর জন্মের পর খেজুর দ্বারা তাহনীক করানোর বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমত রয়েছে।[১৩]

উল্লেখ্য, নবজাতকের মুখে চর্বিত বস্তু প্রবেশ করানোতে শিশু জিহ্বা দ্বারা নড়াচড়ার কারণে তার দাঁতের মাড়ি মজবুত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এতে সে মাতৃস্তন্যে মুখ লাগানোর প্রতি উৎসাহিত হবে এবং আগ্রহের সাথে পূর্ণশক্তি দিয়ে দুধ পান করতে অভ্যস্ত হবে। এছাড়াও খেজুরে প্রচুর পুষ্টিগুণ থাকার কারণে শিশু সার্বিকভাবে উপকৃত হবে। তার মিষ্টভাষী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে শিশুকে শালদুধ অবশ্যই পান করাবে। এর বহুবিদ উপকারিতা রয়েছে।

(গ) আক্বীক্বাহ দেওয়া :

‘নবজাত শিশুর মাথার চুল অথবা সপ্তম দিনে নবজাতকের চুল ফেলার সময় যবহকৃত ছাগল বা দুম্বাকে আক্বীক্বাহ বলা হয়’ *(আল-মু‘জামুল ওয়াসীত্ব)*। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, জাহেলী যুগে আমাদের কারও সন্তান ভূমিষ্ট হ’লে তার পক্ষ হ’তে একটা বকরী যবেহ করা হ’ত এবং তার রক্ত শিশুর মাথায় মাখিয়ে দেওয়া হ’ত। অতঃপর ‘ইসলাম’ আসার পর আমরা শিশু জন্মের সপ্তম দিনে বকরী যবেহ করি এবং শিশুর মাথা মুণ্ডন করে সেখানে ‘যাফরান’ মাখিয়ে দেই’।[১৪] রাযীন-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ঐদিন আমরা শিশুর নাম রাখি’।[১৫] আক্বীক্বাহ করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوْا عنه دَمًا وأَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى ‘সন্তানের সাথে আক্বীক্বাহ জড়িত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্ট দূর করে দাও’।[১৬] অর্থাৎ তার জন্য একটি আক্বীক্বার পশু যবেহ কর এবং তার মাথার চুল ফেলে দাও। তিনি বলেন, كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ اومُرْتَهَنٌ بعقيقَتِه تُذْبَحُ عنه يومَ السَابِعِ ويُسَمَّى وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ ‘প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়’।[১৭] উল্লেখ্য

---

৭. মুসলিম হা/৩০০৯; মিশকাত হা/২২২৯।
৮. মুসলিম হা/২৮৪; মিশকাত হা/৪১৫০।
৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫১।
১০. বুখারী হা/৫৪৬৭; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৪০; আহমাদ হা/২৪৬৬৩।
১১. বুখারী হা/৫৪৭০, মুসলিম হা/২১৪৪।
১২. আহমাদ হা/১২০৪৭, আবু ইয়া‘লা ৩৮৮২, সনদ ছহীহ ; আল-বিদায়াহ ৯/২৭৪; ইবনুল কাইয়িম, তোহফাতুল মাওলূদ ৩৩ পৃষ্ঠা।
১৩. মুসলিম, শরহ নববী ১৪/১২২-২৩।
১৪. আবুদাঊদ হা/২৮৪৩; আছার ছহীহাহ হা/৪৬৩।
১৫. মিশকাত হা/৪১৫৮ ‘যবহ ও শিকার’ অধ্যায়, ‘আক্বীক্বা’ অনুচ্ছেদ।
১৬. বুখারী হা/৫৪৭১; মিশকাত হা/৪১৪৯ ‘আক্বীক্বা’ অনুচ্ছেদ।
১৭. আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/১১৬৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৪১৮৪।

যে, সাত দিনের পূর্বে শিশু মারা গেলে তার জন্য আক্বীক্বার কর্তব্য শেষ হয়ে যায়।[১৮]

(ঘ) সুন্দর নাম রাখা :

সন্তানের সুন্দর ও ভাল অর্থবোধক নাম রাখতে হবে। কারণ তার এ নামই জীবন চলার পথে প্রভাব ফেলতে পারে। জন্মের পরেই সন্তানের নাম রাখা যাবে এবং সপ্তম দিনে আক্বীকার সময়েও নাম রাখা যায়। রাসূল (ছাঃ) সুন্দর নাম রাখার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন, إِذَا أَبْرَدْتُمْ بَرِيدًا فَأَبْرِدُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الاِسْمِ 'তোমরা যখন আমার কাছে কোন দূত পাঠাবে তখন সুন্দর চেহারা ও সুন্দর নাম বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাঠাবে'।[১৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মন্দ নাম পরিবর্তন করে দিতেন।[২০] এমনকি কোন গ্রাম বা মহল্লার অপসন্দনীয় নামও তিনি পরিবর্তন করে দিতেন।[২১] তাঁর কাছে আগন্তুক কোন ব্যক্তির নাম অপসন্দনীয় মনে হ'লে তিনি তা পাল্টে দিয়ে ভাল নাম রেখে দিতেন।[২২]

ভাল নাম সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ), إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ 'আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হ'ল 'আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান'।[২৩] 'আল্লাহ্‌র দাস' বা 'করুণাময়ের দাস' একথাটা যেন সন্তানের মনে সারা জীবন সর্বাবস্থায় জাগরুক থাকে। সেজন্যই 'আব্দুল্লাহ' ও 'আব্দুর রহমান' নাম দু'টিকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। অতএব আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নামের সাথে 'আব্দ' সংযোগে নাম রাখাই উত্তম।

অমুসলিমদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও শিরক-বিদ'আতযুক্ত নাম বা ডাকনাম রাখা যাবে না। তাছাড়া অনারবদের জন্য আরবী ভাষায় নাম রাখা আবশ্যক। কেননা অনারব দেশে এটাই মুসলিম ও অমুসলিমের নামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। আজকাল এ পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। তাই নাম রাখার আগে অবশ্যই সচেতন ও যোগ্য আলেমের কাছে পরামর্শ নিতে হবে।

(ঙ) সুশিক্ষাদান :

শিক্ষা অর্জন করা সকলের জন্য ফরয। সন্তানকে সুশিক্ষায় গড়ে তুলতে পারলেই সে সন্তান উভয় জগতে মাতা-পিতার কল্যাণে আসবে। আল্লাহ তা'আলা প্রথম যে অহী নাযিল করেছেন তাতে শিক্ষা অর্জন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে। পড়, আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন' *(আলাক্ব ৯৬/১-৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের (পুরুষ ও নারী উভয়ের) জন্য ফরয'।[২৪] তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়'।[২৫]

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্য হবে স্রষ্টাকে জানা এবং তাঁর প্রেরিত বিধানসমূহ অবগত হওয়া। প্রকৃত শিক্ষা হ'ল সেটাই যা খালেক্ব-এর জ্ঞান দান করার সাথে সাথে 'আলাক্ব-এর চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। মানবীয় জ্ঞানের সম্মুখে যদি অহি-র জ্ঞানের অভ্রান্ত সত্যের আলো না থাকে, তাহ'লে যেকোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তুগত উন্নতি তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা প্রয়োজন। তবে উচ্চ শিক্ষার নামে সহশিক্ষা পরিহার করা উচিত। একান্ত প্রয়োজনে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে পড়াতে হ'লে তাদের পর্দার ব্যাপারে গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। অন্যথা সন্তান নৈতিকতা হারিয়ে অপূরণীয় ক্ষতিতে নিমজ্জিত হবে। সন্তান বাইরে পড়া-শুনা করতে গেলে তার দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচির খবর রাখতে হবে। সে নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকার সুবাধে কোন সন্ত্রাসবাদের সথে জড়িয়ে পড়ছে কী-না সে বিষয়ে পিতা-মাতাকে খোঁজ রাখতে হবে। নতুবা সে নিজে ধ্বংস হবে, পরিবারকে ধ্বংস করবে এবং গোটা জাতিকে এক ভয়ানক পরিস্থিতিতে নিক্ষেক করবে।

(চ) শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া :

পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব হ'ল সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া। পায়খানা পেশাব করার পদ্ধতি, বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার দো'আ, সকলের সাথে সদাচারণ, সালাম বিনিময়, শিক্ষক ও গুরুজনদের সম্মানসহ সকল বিষয়ে সন্তানকে শিক্ষা দিবে পিতা-মাতা। প্রয়োজনে শাসন করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا 'তুমি তোমার পরিবারের উপর হ'তে শিষ্টাচারের লাঠি উঠিয়ে নিও না'।[২৬] তিনি আরো বলেন, عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ 'তোমরা লাঠি ঐ জায়গায় লকটিয়ে রাখ যেখানে গৃহবাসীর দৃষ্টি পড়ে। কারণ এটা তাদের জন্য আদব তথা শিষ্টাচারের মাধ্যম'।[২৭] শাসন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। শারীরিক শাসনের ক্ষেত্রে দশ বেত্রাঘাতের বেশী করা যাবে না। তবে তিন বেত্রাঘাতে সীমাবদ্ধ থাকা ভাল। এমন আঘাত করা যাবে না যাতে সন্তানের দেহ ক্ষত হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

---

১৮. নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১ পৃঃ।
১৯. ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩৬৭৯; ছহীহাহ হা/১১৮৬।
২০. তিরমিযী হা/২৮৩৯; মিশকাত হা/৪৭৭৪; ছহীহাহ হা/২০৭।
২১. ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/২০৮।
২২. মুসনাদুশ শামেঈন হা/১৬২৭; ছহীহাহ হা/২০৯।
২৩. মুসলিম হা/২১৩২; মিশকাত হা/৪৭৫২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।
২৪. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩; মিশকাত হা/২১৮।
২৫. বুখারী, মিশকাত হা/২১০৯।
২৬. আহমাদ হা/২২১২৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৭০; মিশকাত হা/৬১।
২৭. মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩২১৭; ছহীহাহ হা/১৪৪৭।

'আল্লাহ্র দণ্ডবিধি ব্যতীত কোন ক্ষেত্রে দশ বেত্রাঘাতের বেশী শাস্তি নেই।[২৮] ইবনু ওমর (রাঃ) কুরআন পাঠের উচ্চারণে ভুল করার কারণে স্বীয় সন্তানকে প্রহার করছিলেন।[২৯] তবে এই শাসন কেবল তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে হতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) জনৈক লোককে উপদেশ স্বরূপ বলেন, তোমার সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দাও। কারণ তুমি তোমার সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে যে, তুমি তাকে কি আদব শিখিয়েছ, তুমি তাকে কি শিক্ষাদান করেছ? আর সে তোমার সাথে স্বদাচারণ ও তোমার আনুগত্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩০] সূরা তাহরীমের ৬ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী (রাঃ) সহ প্রমূখ বলেন, أَوْصُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَدِّبُوهُمْ 'তোমরা নিজেদের ও পরিবার-পরিজনদের আল্লাহ ভীতির ব্যাপারে উপদেশ দাও এবং তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।[৩১]

(ছ) সন্তানকে ইবাদত পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া :

সন্তানকে ছোট থেকেই যাবতীয় ইবাদত পালনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাকে আক্বীদা, তাওহীদ, রিসালাত ও শিরক-বিদ'আত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। বিশেষতঃ ছালাত ও ছাওমের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক' *(ত্বাহা ২০/১৩২)*। তিনি আরো বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 'আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর' *(শু'আরা ২৬/২১৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) তার পিতা অতঃপর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, 'তোমাদের সন্তান যখন সাত বৎসরে পদার্পণ করে তখন তাকে ছালাতের প্রশিক্ষণ দাও। আর দশ বছর হ'লে তাকে ছালাতের জন্য শাসন কর এবং তাদের পরস্পরের বিছানা আলাদা করে দাও'।[৩২] ছাহাবায়ে কেরাম ছোট বাচ্চাদের ছালাত ও ছিয়ামের প্রশিক্ষণ দিতেন। তারা ছোট শিশুদের সাথে করে ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যেতেন। রুবা'ই বিনতে মু'আব্বিয (রাঃ) বলেন, فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ- 'পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন (আশূরার) ছাওম পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদের ছাওম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।[৩৩] ইমাম নববী ও ইবনু হাজার প্রমূখ বলেন, এ হাদীছে শিশুদের জন্য ছিয়াম রাখা শরী'আত সম্মত হওয়ার, তাদেরকে ইবাদতে অভ্যাস্ত করার জন্য হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রমাণ মেলে। তবে এটি তাদের জন্য আবশ্যক নয়।[৩৪]

(জ) সন্তানের প্রতি খরচ করা :

সন্তান স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত তাদের যাবতীয় খরচ পিতা-মাতাকে বহন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব হ'ল ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রসূতি মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ 'তোমার পরিবারেরও তোমার প্রতি অধিকার রয়েছে। অতএব প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব প্রদান কর'।[৩৫] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ 'আর তুমি সাধ্যমত তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ কর'।[৩৬] তিনি আরো বলেন, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ 'প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব'।[৩৭] আবু সুফিয়ান (রাঃ) তার সন্তানদের প্রতি খরচ করতে কার্পণ্য করলে তার স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা রাসূল (ছাঃ)- কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমাকে এত পরিমাণ খরচ দেন না, যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হ'তে পারে যতক্ষণ না আমি তার অজান্তে মাল থেকে কিছ নিই। তখন তিনি বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে যা যথেষ্ট হয় তা তুমি নিতে পার'।[৩৮] তাছাড়া সন্তানের প্রতি খরচ করলে সেটি ছাদাক্বাহ হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ 'মানুষ স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য পুণ্যের আশায় যখন ব্যয় করে তখন সেটা তার জন্য ছাদাক্বাহ হয়ে যায়'।[৩৯] তবে সন্তানকে অর্থ দেওয়ার পর পিতা-মাতাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, সন্তান সে অর্থ কোন পথে ব্যয় করছে। দেখা যায়, সন্তানের কাছে অধিক অর্থ থাকার কারণে অপচয় করার পাশাপাশি বিপথগামী হয়ে পড়ছে। এমনটি তাদের অবহেলা ঘটলে পিতা-মাতায় দায়ী হবে।

যখন পিতা তার সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা দান ও তার প্রতি যা কিছু ব্যয় করা দরকার তা করার মাধ্যমে তার উপর ন্যস্ত কর্তব্য পালন করবে, তখন তার সন্তানও পিতা-মাতার প্রতি সদয় আচরণ করবে এবং তার যাবতীয় অধিকারকে সংরক্ষণ করবে। আর পিতা যদি এ ব্যাপারে ত্রুটি করেন তাহ'লে সন্তানের অবাধ্যতা সম্ভাবনা হওয়ার রয়েছে।

---

২৮. বুখারী হা/৬৮৪৯; মিশকাত হা/৩৬৩০।
২৯. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৮০, সনদ ছহীহ।
৩০. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৪৮৭৭; শু'আবুল ঈমান হা/৮৬৬২।
৩১. বুখারী ১৬/২৮১; শু'আবুল ঈমান হা/৮৬৪৮।
৩২. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৩০৫৩; আবুদাঊদ হা/৪৯৫; ছহীহুল জামে' হা/৪০২৬; মিশকাত হা/৫৭২।
৩৩. বুখারী হা/১৯৬০; মুসলিম হা/১১৩৬।
৩৪. শারহুন নববী আলা মুসলিম ৮/১৪; ফাতহুল বারী ৪/২০১।
৩৫. বুখারী হা/১৯৬৮; মিশকাত হা/২০৬১।
৩৬. আহমাদ হা/২২১২৮; মিশকাত হা/৬১; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৭০।
৩৭. বুখারী হা/১৪২৬; মুসলিম হা/১০৩৪' মিশকাত হা/১৯২৯।
৩৮. বুখারী হা/৫৩৬৪; মুসলিম হা/১৭১৪; মিশকাত হা/৩৩৪২।
৩৯. বুখারী হা/৫৫; মুসলিম হা/১০০২।

মা দিবস ও বৃদ্ধাশ্রম : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

-লিলবর আল-বারাদী

ভূমিকা :

মানুষ শিশুকালে এমন অসহায় ও মুখাপেক্ষী যে তার নিজের কোন কাজ করার শক্তি থাকে না, পিতামাতার এই সময় সন্তানদেরকে অতি যত্নে লালন-পালন করেন। তারা কখনও বিরক্ত বোধ করেন না। যদি কখনও রাগ করেন পরক্ষণেই পরম মমতায় সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নেন। আদরে-সোহাগে শান্ত হয় সন্তান। পিতামাতা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ায়, নিজের প্রতি খেয়াল না করে সর্বদা তার সন্তানের চিন্তায় মশগুল থাকে। কিভাবে সন্তান মানুষের মত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবে? পিতামাতা পৃথিবীর সব কিছু ছাড় দেন তার সন্তানের কল্যাণ চিন্তায়।

অথচ সন্তান কি করে? যখন সে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, তখন ভুলে যায় পিতামাতার কথা। যেমনটি পশু-পাখিরা করে থাকে। বৃদ্ধ পিতা-মাতা তাদের কাছে বোঝা হয়ে যায়। তাদেরকে নিজেদের কাছে রাখতে চায় না। তাদের বিষয়ে চরম অবহেলা করে, তাদেরকে সমাজে চলার অযোগ্য মনে করে। অফিসের বস-কলিগদের সাথে পরিচয় করে দিতেও লজ্জাবোধ করে। কারণ পিতা-মাতা সেকেলে, তারা আয় করতে পারে না। ভরণ-পোষণ ও চিকিৎসা খরচ অনেক, তাদের চিন্তা-চেতনা প্রগতিশীল নয়। তাদের সংস্পর্শে নতুন প্রজন্ম বড় হ'লে নিচু মনের হবে। সারাক্ষণ তারা এটা সেটার চাহিদা করে, সর্বদা বকবক করে, তারা সংসারের বোঝা। বাসায় নেওয়ার মত যথেষ্টও ঘর নেই। এরকম সহস্র অযুহাতে অপদার্থ ছেলে-মেয়েরা পিতামাতাকে একটি নিরাপদ স্থানে ফেলে আসে। যার নাম বৃদ্ধাশ্রম। বৃদ্ধাশ্রমে রাখার পর তাদের কোন খোঁজ-খবর রাখার প্রয়োজনও বোধ করে না। তাই এভাবে ধুঁকে ধুঁকে পিতা-মাতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তখন সন্তান তার অবহেলিত পিতা-মাতাকে বেশী বেশী স্মরণ করে। আর এ থেকেই গড়ে উঠেছে মা দিবস, বাবা দিবস ইত্যাদি। অথচ ইসলামে কোন দিবস পালনের বিধান নেই।

মা দিবসের সূচনা :

ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ লিখেছেন, মা দিবস উদযাপন প্রথম শুরু হয়েছে গ্রিসে। গ্রিকরা তাদের মাতা-দেবীর পূজা করত। যার নাম হ'ল 'রিয়া'। এটা তারা বসন্তকালীন উৎসবের একটি অংশ হিসাবে উদযাপন করত। প্রাচীন রোমেও এ রকম দিবস উদযাপন করা হ'ত 'সাইবল' দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে 'সাইবল' হ'ল সকল দেব-দেবীর মাতা। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ২৫০ সালে রোমে 'হিলারিয়া' নামে একটি ধর্মীয় উৎসব পালন করা হ'ত, দেবী মাতা 'রিয়ার' সম্মানে। এটা উদযাপনের সময় ছিল ১৫ই মার্চ থেকে ১৮ই মার্চ। গ্রিক ও রোমান পৌত্তলিক সমাজে দেব-দেবীর মায়ের প্রতি ধর্মীয়ভাবে শ্রদ্ধা জানাতে এসব দিবস পালিত হ'ত। এটাই পরবর্তীকালে মা দিবস হিসাবে বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে ।

গবেষকগণ তাদের গবেষণায় আরো দেখিয়েছেন যে, রোমানরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে যখন পৌত্তলিক ধর্ম পালনে বাধাগ্রস্ত হ'ল এবং তারা খৃষ্টধর্মকে বিকৃত করে তাতে অনেক পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করাল, তখন এরই অংশ হিসাবে খ্রিস্টান পাদ্রি ও ধর্মযাজকরা সংস্কার করে এ দিবসকে মাতা মেরী (মরিয়ম)-এর প্রতি সম্মান জানানোর জন্য বরাদ্দ করে দিল। এ থেকে মায়ের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য খ্রিস্টান সমাজে একটি দিবসের প্রচলন হয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের যুবক-যুবতীরা এ দিনটাকে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, তাদের জন্য উপহার সামগ্রী ক্রয় ও প্রদান করার জন্য বেছে নিল। এটা হ'ল ইংল্যান্ডের কথা। আর আমেরিকার ঘটনা একটু ভিন্ন।

আমেরিকার নারী চিন্তাবিদ, 'অ্যানম জারাফস' তার মাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মায়ের ভালোবাসা অক্ষুণ্ন রাখতে জীবনে বিবাহ করেননি। তিনি পড়াশোনা করেছেন পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় চার্চ নিয়ন্ত্রিত একটি স্কুলে। তার মায়ের মৃত্যুর দু'বছর বছর পর তিনি আন্দোলন শুরু করলেন। মায়ের স্মরণে একদিন সরকারী ছুটির। তার ধারণা হ'ল, মায়েরা সন্তানদের জন্য সারা জীবন যা করেন, তা সন্তানেরা অনুভব করে না। তাই যদি এ উপলক্ষে একটি ছুটি দেয়া হয়, একটি দিবস পালন করা হয়, তাহ'লে সন্তানদেরকে মায়ের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া সম্ভব হবে। তার আন্দোলনে আমেরিকান কংগ্রেসের অনেক রাজনীতিবিদ একাত্মতা ঘোষণা করেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯০৮ সালের ১০ই মে প্রাথমিক ভাবে আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়া, ফ্লোরিডা, ওকালাহোমা ও পেনসালভানিয়াতে মা দিবস পালন শুরু হয়। ১৯১০ সালে এসব অঙ্গরাজ্যে সরকারীভাবে মা দিবস ও তাতে ছুটি পালন শুরু হয়। এভাবে আমেরিকায় মা দিবস পালনের সূচনা হয়।

এরপর ১৯১১ সাল হ'তে সমগ্র আমেরিকায় সরকারীভাবে মা দিবস পালিত হয়। আমেরিকান কংগ্রেস ১৯১৩ সালের ১০ই মে এটা সরকারীভাবে অনুমোদন করে। তারা মে মাসের প্রথম রবিবারকে মা দিবস পালনের জন্য নির্ধারণ করে। আমেরিকার অনুকরণে মেক্সিকো, কানাডা, ল্যাটিন আমেরিকা, চীন, জাপান ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে শুরু হয় 'মা দিবস' পালন। বর্তমানে আমাদের দেশের প্রগতিশীল সম্প্রদায় এ দিবস ৮ই মে পালনে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে।[১] উল্লেখ্য যে, ১৯শে জুন আবার বিশ্ব 'পিতাদিবস' পালিত হয়।

দেশে দেশে মা দিবস :

যদিও আমেরিকায় এটা পালিত হয় মে মাসের প্রথম রবিবারে। কিন্তু অন্যান্য দেশে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন নরওয়েতে মা দিবস পালিত হয় মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে। আর্জেন্টিনায় পালিত হয় অক্টোবর মাসের দ্বিতীয়

১. *দৈনিক মানবকণ্ঠ, ১২ই মে ২০১৩, শিরোনাম: বিশ্ব মা দিবসের ইতিহাস।*

রবিবারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিত হয় মে মাসের প্রথম রবিবারে। ফ্রান্সে ও সুইডেনে পালিত হয় মে মাসের শেষ রবিবারে। জাপানে পালিত হয় মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারে *(তদেব)*। এখানে প্রতীয়মান হয় যে, তারিখের ভিন্নতা থাকলেও রবিবারে 'মা দিবস' পালনে সকলে একমত। এর দ্বারা মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে, এটা খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি। মুসলমানরা কখনো এটা পালন করতে পারে না। মনে রাখতে হবে যে, মুসলমান অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে দায়বদ্ধ নয় যে, সকল ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য, দাসত্ব ও অন্ধ অনুকরণ বজায় রাখতে হবে। যারা এ দিবস পালনের মানসিকতা রাখে কেবল তারাই তাদের দলভুক্ত। কিন্তু কোন মুসলমান কোন প্রকার দিবস পালনে আগ্রহী হ'তে পারে না।

মা দিবস পালনের বিধান :

যারা মাকে যথার্থ গুরুত্ব দেয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল তারাই মা দিবস পালন করে থাকে। পিতার প্রতিও তেমন গুরুত্ব দেয় না অনেকে। অথচ পিতা-মাতাকে সম্মান করা, ভালোবাসা, তাদের সাথে সদাচরণ করা ফরয। ইসলাম মাকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছে অন্য কোন ধর্ম ততটা দেয়নি। মায়ের জন্য একটি দিবস পালন করলে তাদের প্রতি কর্তব্য পালন হয়ে যায় না। ইসলাম পিতা-মাতার জন্য যে গুরুত্ব দিতে বলেছে, তা নিজের স্ত্রী, সন্তানদের চেয়েও অধিক। কিন্তু ইসলামে এই দিবস পালনের কোন স্থান নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের মাঝে এরূপ দিবস পালনের প্রমাণ নেই। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدٌّ 'যে কেউ এমন আমল করবে, যার ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২] তিনি অন্যত্র বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের এ ধর্মে এমন নতুন কিছুর প্রচলন করবে, যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৩]

আজ আমরা সভ্য সমাজের প্রগতিশীল মানুষ। বিজাতীয় সংস্কৃতিকে বুকে লালন করে নিজেদের ইয্যত সম্মান ধুলায় মিশিয়ে দিতে বসেছি। মুসলমান হিসাবে ঐ সকল বিজাতীয় আচার-অনুষ্ঠানকে পরিহার করতে হবে।

ছাহাবী আবু ওয়াকেদ (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) খায়বার যাত্রায় মুশরিকদের একটি গাছ অতিক্রম করলেন। যার নাম ছিল 'যাতু আনওয়াত'। এর উপর তারা অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। তখন কতক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জন্যও এমন একটি 'যাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, سُبْحَانَ اللَّه هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ) وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 'সুবহানাল্লাহ, এ তো মূসা (আঃ)-এর জাতির মত কথা। আমাদের জন্য একজন প্রভু তৈরি করে দিন, তাদের প্রভুর ন্যায়। আমি ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধানুকরণ করবে'।[৪] আজ আমরা যদি মুসলমান হয়ে তাদের আচার-অনুষ্ঠান পালন করি বা অনুকরণ করি তবে আমরা আর মুসলমান থাকব না, আমরা তাদের দলভুক্ত হয়ে যাব। এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুকরণ করবে, ঐ ব্যক্তি তাদের মধ্যে গণ্য হবে'।[৫]

মুসলমান এমন একটি জাতি, যাদের নিজস্ব অতীব উৎকৃষ্ট ও সাবলীল সংস্কৃতি আছে। অমুসলিমদের অনুকরণে মা দিবস পালন করার অর্থ হ'ল তাদের ও সাদৃশ্য অবলম্বন করা। যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। কোন অমুসলিমদের আচার-অনুষ্ঠান কিংবা কৃষ্টি-কালচার মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় নয়।

বৃদ্ধাশ্রমের সূচনা :

বৃদ্ধাশ্রম শব্দটি মূলত বৃদ্ধ+আশ্রম ছিল। বৃদ্ধাশ্রম হ'ল অবহেলিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জন্য আবাসস্থল বা আশ্রয়। তাদের সারাজীবনের অবদানের যথার্থ স্বীকৃতি শেষ সময়ের সম্মান ও নিরাপত্তা দেয়া হয় এসব বৃদ্ধাশ্রমে। এখানে তারা নির্ভাবনায়, সম্মানের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে বাকী দিনগুলো কাটাতে পারেন। বৃদ্ধাশ্রমে চিকিৎসাসহ সকল ব্যবস্থা আছে। পৃথিবীর প্রথম বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচীন চীনে। ঘর ছাড়া অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের এই উদ্যোগ ছিল শান রাজবংশের। খ্রিষ্টপূর্ব ২২০০ শতকে পরিবার থেকে বিতাড়িত বৃদ্ধদের জন্য আলাদা এই আশ্রয়কেন্দ্র তৈরী করে ইতিহাসে আলাদা জায়গাই দখল করে নিয়েছে এই শান রাজবংশ। পৃথিবীর প্রথম প্রতিষ্ঠিত সেই বৃদ্ধাশ্রমে ছিল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আরাম-আয়েশের সব রকম ব্যবস্থা। ছিল খাদ্য ও বিনোদন ব্যবস্থা। ঐতিহাসিকগণ এই বৃদ্ধাশ্রমকে প্রাচীন চীনে গড়ে ওঠা সভ্যতারই অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত করেছেন। তবে বর্তমানে চীন, জাপান ও তাইওয়ানের মত দেশের উচ্চবিত্ত সম্পদশালীরা তাদের পিতামাতাকে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন থেকে নারী কর্মী নিয়োগ করে তাদের তত্ত্বাবধানে রেখে পিতা-মাতার সেবা করান। সাপ্তাহিক ছুটিতে তাদের পিতামাতাদের সঙ্গ দেন এবং প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর নেন।[৬]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নয়ন সমগ্র বিশ্বে জীবন প্রত্যাশার মান বৃদ্ধি করে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে সারা বিশ্বে বৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে নর-নারীর গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। একবিংশ শতাব্দীকে কেউ কেউ বার্ধক্যের যুগ বলেও উল্লেখ করেছেন। তবে বার্ধক্যের মোকাবেলা করা বিশ্ব সমাজের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

---

২. বুখারী হা/২০; মুসলিম হা/১৮।
৩. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০।
৪. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪০৮।
৫. আহমাদ, আবূ দাঊদ হা/৪৩৪৭।
৬. দৈনিক বিজয় সংবাদ, ৩রা জানুয়ারী ২০১৫; শিরোনাম: বৃদ্ধাশ্রম নয়, পরিবারই হোক পিতামাতার নিরাপদ আবাস।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম ও ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। বার্ধক্য বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ, যার মোকাবেলা করা নিতান্তই কঠিন কাজ। জাতিসংঘ ৬০ বছর বয়সকে বার্ধক্য হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এ হিসাবে জনসংখ্যার ৬.১ শতাংশ প্রবীণ নর-নারী। ২০২৫ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ১০.১ শতাংশে। উদ্বেগের বিষয় হ'ল, বাংলাদেশে এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দিবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রবীণ সাধারণ পরিবারে বসবাস করেন এবং তখন তাদের ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা ইত্যাদির ভার সন্তানদের ওপর বর্তায়। কিন্তু বর্তমান আধুনিক প্রগতিশীল বস্তুদাবী সমাজে মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা পরিবর্তনের কারণে যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। এতে করে প্রবীণরা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্থাৎ আশ্রয় ও বাসস্থান হারাচ্ছে। এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশের শতকরা ৮৮ ভাগ প্রবীণের, কোন না কোন সন্তান বাইরে থাকে। অর্থাৎ এদের সঙ্গে পিতামাতার যোগাযোগ খুব কম হয়। এতে করে বৃদ্ধ পিতা-মাতারা আর্থ-সামাজিক সমস্যায় ভোগেন। বাংলাদেশে শতকরা ২০ জন হয় একাকী থাকেন অথবা স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে থাকেন। দরিদ্র প্রবীণদের সংখ্যা শতকরা ৩৭ জন। বর্তমান সরকার প্রবীণদের জন্য বয়স্ক ভাতা চালু করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ১৭ লাখ দরিদ্র প্রবীণ সাহায্য পাচ্ছে (সূত্র : বাংলাপিডিয়া)।

তবে পিতা-মাতার এই অবমাননার জন্য তারা নিজেরাও অনেকাংশে দায়ী। পিতা-মাতা ও সন্তান উভয় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্মত শিক্ষা দিতে পারেন নি। যে শিক্ষা মানুষকে তাক্বওয়াশীল করে। যদি ঐ পিতা-মাতা একটি কিংবা দু'টির বেশী সন্তান গ্রহণ করতেন তা'হলে তাদের মধ্য থেকে কোন না কোন সন্তান পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পরায়ণ হ'ত। অপরদিকে সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য তাছাড়া অনেকে ইসলামী শরী'আত মোতাবেক তাদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন না করে কম-বেশী করে থাকে ইত্যাদি। অনেকে নিজেদের জীবনের সকল ধন-সম্পদ সন্তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়, নিজের জন্য কিছুই রাখেন না । কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের কাছ থেকে এর একটি ক্ষুদ্র অংশও তারা পাচ্ছেন না। আবার এমনও দেখা যায় যে, সন্তানের টাকা-পয়সার অভাব নেই, কিন্তু পিতা-মাতাকে নিজের কাছে রাখার প্রয়োজনবোধ করছে না, বা বোঝা মনে করছে। নিজেই পিতামাতাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বৃদ্ধাশ্রমে, নতুবা অবহেলা ও দুর্ব্যবহার করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে, যেন পিতা-মাতা নিজেরাই সরে যান। তার সাধের পরিবার থেকে। আবার এমনও হয়, টাকার অভাব না থাকলেও তার পর্যাপ্ত সময়ের অভাব, তাই পিতা-মাতার দেখাশুনা করা বা তাদের সঙ্গে কথা বলার মত যথেষ্ট সময় নেই। অতএব সন্তান বৃদ্ধ পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে অন্যদের সঙ্গে একত্রে সময় কাটানোর সুযোগ করে দেয়। এভাবে নানা অজুহাতে পিতা-মাতাকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। অনেক নামী-দামী বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, চাকরিজীবী যারা এক সময় খুব বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে এসে নিজের সন্তানের দ্বারাই অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে বৃদ্ধাশ্রমের স্থায়ী বাশিন্দা হ'তে বাধ্য হচ্ছেন। অনেক সন্তান বা আত্মীয়-স্বজন আর তাদের কোন খবরও নেন না। তাদের দেখতেও আসেন না, এমনকি প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা বা জিনিসপত্রও পাঠান না। বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানে বা ঈদের আনন্দের সময়ও পিতা-মাতাকে বাড়িতে নেন না। এমনও শোনা যায়, অনেকে পিতা বা মাতার মৃত্যুশয্যায় বা মৃত্যুর পরও শেষবারের মতও দেখতে যান না। বৃদ্ধাশ্রমের কর্তৃপক্ষই কবর দেয়াসহ সকল ব্যবস্থা করেন। তার সন্তানেরা কোন খবর রাখেন না।

কেস স্টাডি :

১. সদ্য বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো এক মা তার ছেলেকে চিঠি লিখেছেন- 'খোকা! তুই কেমন আছিসরে? বউমা আর আমাদের ছোট দাদুভাই সবাই ভালো আছে তো? জানি, তোদের তিন জনের ছোট সংসারে প্রত্যেকেরই খুব কাজ। তবুও তোদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ। একদিন একটু সময় করে এই বুড়ি মাকে দেখতে আয় না! কিরে, আসবি না? ও বুঝতে পেরেছি, এখনো আমার উপর থেকে তোদের অভিমান যায়নি। আমাকে যেদিন বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলি, সেদিন ঝগড়া করেছিলাম বৃদ্ধাশ্রম থেকে আমাকে নিতে আসা লোকজনদের সঙ্গে। জানি শেষ দিনটাতে একটু বেশী রকমেরই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম, তাছাড়া আর কী বা আমি করব বল? সময়মত ওরা এসে আমার জিনিসপত্র সব জোর করে গাড়িতে উঠিয়ে নিল, তারপর বারবার তাগাদা দিতে লাগল। আমি তোর সঙ্গে দেখা করে আসার জন্য তাদের কাছে সময় চেয়েছিলাম, তারা সময় দিলেও শেষ পর্যন্ত তুই আসিসনি। তুই কাজে এত ব্যস্ত থাকিস তখন আমার মনে ছিল না। পরে মনে পড়েছিল, তাই তোর সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছি। তুই রাগ করিসনি তো? আর সেদিন আমার সেই যিদ দেখে বউমা তো রেগেই আগুন। তাছাড়া তার তো রাগবারই কথা। আমাকে নিয়ে যেতে যারা এসেছিল, তাদের তড়িঘড়িতে পাশের বাড়ি থেকে কেউ কেউ উঁকি দিতে লাগল। এতে তো বউমার একটু লজ্জাবোধ হবেই। সেদিন তোদের যে অপমান করে এসেছি তোরা সেসব ভুলে যাস কেমন করে? আমার কথা ভাবিস না। আমি খুব ভালো আছি। আর কেনইবা ভালো থাকব না বল? তোরা তো আমার ভালো থাকবারই বন্দোবস্ত করে দিয়েছিস। তবে একটা কথা, আমার কথা যদি তোর কখনো বা কোনদিন মনে পড়ে, তখন যেন নিজেকে তুই শেষ করে দিস না। তুই এখনো একশ' বছর বেঁচে থাক'।

২. বৃদ্ধাশ্রম থেকে আরেকজন মায়ের চিঠি, 'আমার আদর ও ভালোবাসা নিও। অনেক দিন তোমাকে দেখি না, আমার খুব কষ্ট হয়। তোমার ছোটবেলার একটি ছবি আমার কাছে রেখে দিয়েছি। ছবিটা দেখে দেখে মনে মনে ভাবি, এটাই কি আমার সেই খোকা! কান্নায় আমার বুক ভেসে যায়। আমার জন্য তোমার কী অনুভূতি আমি জানি না। তবে ছোটবেলায় তুমি আমাকে ছাড়া কিছুই বুঝতে না। আমি যদি কখনও তোমার চোখের আড়াল হ'তাম, মা.. মা.. বলে চিৎকার করতে। মাকে ছাড়া কারও কোলে তুমি যেতে না। তুমি

Contents

একমুহূর্ত আমাকে না দেখে থাকতে পারতে না। সাত বছর বয়সে তুমি আমগাছ থেকে পড়ে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছিলে। তোমার বাবা হালের বলদ বিক্রি করে তোমার চিকিৎসা করিয়েছিলেন। তখন তিন দিন, তিন রাত তোমার পাশে না ঘুমিয়ে, না খেয়ে, গোসল না করে কাটিয়েছিলাম। এগুলো তোমার মনে থাকার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার বিয়ের গয়না বিক্রি করে তোমার পড়ার খরচ জুগিয়েছিলাম। হাঁটুর ব্যথাটা তোমার মাঝে মধ্যেই হ'ত। বাবা, এখনও কি তোমার সেই ব্যথাটা আছে? রাতের বেলায় তোমার মাথায় হাত না বুলিয়ে দিলে তুমি ঘুমাতে না। এখন তোমার কেমন ঘুম হয়? আমার কথা কি তোমার একবারও মনে হয় না? তুমি দুধ না খেয়ে ঘুমাতে না। তোমার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার কপালে যা লেখা আছে হবেই। আমার জন্য তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি খুব ভালো আছি। কেবল তোমার চাঁদ মুখখানি দেখতে আমার খুব মনে চায়। তুমি ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করবে। তোমার বোনেরও খবরা-খবর নিব। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বল আমি ভালো আছি। আমি দো'আ করি, তোমাকে যেন আমার মত বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে না হয়। কোন এক জ্যোৎস্না ভরা রাতে আকাশ পানে তাকিয়ে জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে একটু ভেবে নিও। বিবেকের কাছে উত্তর পেয়ে যাবে। তোমার কাছে আমার শেষ একটা ইচ্ছা আছে। আমি আশা করি তুমি আমার শেষ ইচ্ছাটা রাখবে। আমি মারা গেলে বৃদ্ধাশ্রম থেকে নিয়ে আমাকে তোমার বাবার কবরের পাশে কবর দিও। এজন্য তোমাকে কোন টাকা খরচ করতে হবে না। তোমার বাবা বিয়ের সময় যে নাকফুলটা দিয়েছিল সেটা আমার কাপড়ের আঁচলে বেঁধে রেখেছি। নাকফুলটা বিক্রি করে আমার কাফনের কাপড় কিনে নিও।

৩. ২০০৬ সালে অবসর নেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আব্দুল আউয়াল (৭০)। দীর্ঘ ১৭ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশা থেকে অবসরের পর কিছুদিন ভালোই চলছিল তার। অধ্যাপক আব্দুল আউয়ালের সংসারে দুই ছেলে, এক মেয়ে। তিন সন্তানের মধ্যে মেয়ে সবার বড়, নাম রোজিনা ইয়াসিন আমেরিকা প্রবাসী। এরপর বড় ছেলে উইং কমান্ডার (অব.) ইফতেখার হাসান। সবার ছোট ছেলে রাকিব ইফতেখার হাসান অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। জীবনে এত কিছু থাকার পরও আজ তার দু'চোখে অন্ধকার। থাকেন আগারগাঁও প্রবীণ নিবাসে।

৪. আমেরিকার এক নামকরা ব্যবসায়ী ছিল। তার টাকা পয়সা, ধন-সম্পদে কোন কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু সে মডার্ণ সোসাইটিতে মুখ দেখাতে পারত না শুধু তার মায়ের জন্য। কারণ তার মা ছিল অন্ধ ও কুৎসিত-কদাকার। মায়ের মুখে ছিল আগুনে পোড়া বিশ্রী কালো দাগ। আর মাথার চামড়া পুড়ে গিয়েছিল, মাথায় চুল ছিল না। সব মিলিয়ে তার মা একজন কুশ্রী-কদাকার সেকেলে মানুষ। তাই মডার্ণ সোসাইটিতে নিজের মান-সম্মান ও আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য একদিন সে মাকে বাসা থেকে বের করে দিল। বেচারী একেতো অন্ধ মানুষ তারপরে বৃদ্ধা। কেঁদে কেঁদে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি গাড়ি এসে ধাক্কা দিল, ছিটকে পড়ে বৃদ্ধা মা ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন। তার ছেলে জেনে-শুনে কষ্ট পেল না, ভাবলো আপদ বিদায় হয়েছে। কিছুদিন পর ছেলে তার বিশেষ কিছু কাগজপত্র খুঁজতে খুঁজতে তার মায়ের লেখা একটা ডাইরি পেল। ডাইরিতে লেখা ছিল-

০৫-১২-১৯৮০ : আজ আমি সুন্দরী 'মিস্ আমেরিকা'-এর খেতাব পেয়েছি।

০২-০৫-১৯৮৩ : আজ আমার গর্ভপাত না ঘটানোর জন্য আমার প্রিয় স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে।

০৭-০৩-১৯৮৫ : আজ আমার বাড়িতে আগুন লেগেছিল। আমি বাহিরে ছিলাম। আর আমার কলিজার টুকরা ছেলে বাড়ির ভিতরে ছিল। নিজের জীবন বাজি রেখে শুধু ছেলের জীবন বাঁচাতে গিয়ে আগুনে আমার চুল এবং মুখমণ্ডলসহ আমার সমস্ত সৌন্দর্য পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তথাপি আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু আমার কলিজার টুকরা ছেলের চোখদু'টো আমি বাঁচাতে পারিনি।

০৭-৫-১৯৮৫ : আজ আমার নিজের চোখ দু'টো আমার ছেলেকে দিতে যাচ্ছি। আজকের পর থেকে আর কখনো ডাইরি লিখতে পারব না।

এই ডাইরিটি পড়ে ছেলে পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে দেওয়ালে মাথা আছড়াতে লাগল। হায়! আমি কি করেছি?

ইসলামের আলোকে পিতা-মাতার গুরুত্ব :

ইসলাম চিরন্তন ও সার্বজনীন জীবন বিধান পিতা-মাতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً 'আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে' *(আনকাবূত ২৯/৮)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرا-

'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হ'লে তাদেরকে 'উফ' শব্দ বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল', মমতাবশে তাদের প্রতি, নম্রতার সাথে পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! দয়া কর তাদের প্রতি যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিলেন' *(ইসরা ১৭/২৩-২৪)*।

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে হাদীছে অনেক নির্দেশ এসেছে। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে বড় গোনাহ বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. ثَلاَثًا. قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ

الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. 'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? একথা তিনি (তিনবার) বললেন। সকলেই বললেন, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা'।[৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কবীরা গুনাহসমূহ কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ. قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ– 'আল্লাহ্র সাথে শরীক করা'। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, 'পিতামাতার অবাধ্যতা করা'।[৮] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ- 'কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে অধিক প্রিয়। তিনি বললেন, যথাসময়ে ছালাত আদায় করা। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বললেন, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, 'অতঃপর পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা'।[৯] একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তার নাক ধূলায় ধুসরিত হোক। তার নাক ধূলায় ধুসরিত হোক। তার নাক ধূলায় ধুসরিত হোক'। বলা হ'ল, কার হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ– যে ব্যক্তি তার পিতামাতার একজনকে অথবা উভয়কে বার্ধক্যে পেল। কিন্তু (তাদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না'।[১০] এজন্যই বলা হয় পিতামাতা সন্তানের জান্নাত। যে ব্যক্তি তাদের সেবা-যত্ন ও সম্মান করবে, সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। পিতামাতা যদি কাফির-মুশরিকও হয় তবুও তাদের সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক বজায় রাখাতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا 'তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে' *(লুক্বমান ৩১/১৫)*।

আসমা বিনতে আবূবকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ(ছাঃ)-এর যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা আমার নিকটে এসেছেন, তিনি আমার প্রতি (ভাল ব্যবহার পেতে) খুবই আগ্রহী, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ কর'।[১১] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর দরবারে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সুন্দর আচরণের বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবারও জিজ্ঞেস করল এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা'।[১২] পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যধিক। সন্তান সারা জীবন তাদের পেছনে অতিবাহিত করলেও পিতামাতার ঋণ শোধ করতে পারবে না। পিতামাতার যথাযথ সেবাযত্ন করা আমাদের জন্য যরূরী।

শেষ কথা :

ইসলাম সার্বজনীন, চিরন্তন এবং শ্বাশত জীবনাদর্শ। কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার নামে কিছু তথাকথিত প্রগতিশীল মানুষ বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে সন্তানকে তার পিতামাতার নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে তাদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানে সকল কিছু প্রাপ্তির মাঝেও যা পাওয়া যায় না তা হ'ল নিজের পরিবারের সান্নিধ্য। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ তার সন্তান, নাতী-নাতনীদের সঙ্গে একত্রে থাকতে চায়। তাদের সঙ্গে জীবনের আনন্দ ভাগাভাগী করে নিতে চায়। সারাজীবনের কর্মব্যস্ত সময়ের পর অবসরে তাদের একমাত্র অবলম্বন এই আনন্দটুকুই। বলা যায়, এর জন্যই মানুষ সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকে। যারা অবহেলা করে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের কথা ভুলে যান, তাদেরকে স্মরণ রাখা দরকার যে, এমন সময় তাদের জীবনেও আসতে পারে। যে পিতামাতা একসময় নিজে না খেয়েও সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতেন, তারা আজ কোথায়? কেমন আছেন, সেই খবর নেয়ার সময় যার নেই, তার নিজের সন্তানও হয়ত একদিন তার সঙ্গে এমনই আচরণ করবে। ঈদের দিনে যখন তারা তাদের সন্তানদের কাছে পান না, এমনকি সন্তানের কাছ থেকে একটি ফোনও পান না, তখন অনেকেই নীরবে অশ্রুপাত করেন আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। এমনকি সেই সন্তানকে অভিশাপ দিয়ে থাকেন, তার সন্তান তার সঙ্গে যে আচরণ করল, ভবিষ্যতে তার সাথেও যেন একই আচরণ করে। মনে রাখা উচিত যে, আজ যিনি সন্তান, তিনিই আগামীদিনের পিতা কিংবা মাতা। বৃদ্ধ বয়সে এসে পিতা-মাতা যেহেতু শিশুদের মতো কোমলমতি হয়ে যায়, তাই তাদের জন্য সুন্দর জীবনযাত্রার পরিবেশ তৈরী করাই সন্তানের কর্তব্য। যদি কোন সন্তান তা পূরণে ব্যর্থ হয়, তবে সে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি হারাবে। আর ইলম অর্জন কিংবা ইসলামী অনুশাসন ব্যতীত এই ভয়াবহ পরিণতির সমাধান কখনও সম্ভব নয়। সন্তানের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য আজীবন বৃদ্ধ পিতামাতা নীরবে নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন দিবেন। মনে রেখ, হে আদম সন্তান! পিতা-মাতা যখন সন্তানের জন্য দো'আ করেন তখন মহান আল্লাহ কবুল করেন। আজকের এই তথাকথিত প্রগতিশীল সকল সন্তান তথা গোটা জাতির কাছে প্রশ্ন, মা দিবস, পিতা দিবস পালন কিংবা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো ও তাদেরকে কাঁদানো কি প্রগতির নামে প্রহসন নয়?

অতএব আসুন, আমরা পিতামাতাকে বোঝা মনে না করে পরিবারেই তাদের জন্য যথাসম্ভব সুন্দর পরিবেশ করে দেই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

---

৭. বুখারী হা/২৬৫৪; মুসলিম হা/৮৭; তিরমিযী হা/১৯০১।
৮. বুখারী হা/৬৯২০; আবু দাউদ হা/২৮৭৫।
৯. বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/৮৫।
১০. মুসলিম হা/২৫৫১।
১১.বুখারী হা/২৬২০; মুসলিম হা/১০০৩।
১২.বুখারী হা/৫৯৭১।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের ঝুঁকি

অনুবাদ : কানিজ ফাতেমা স্মৃতি

কর্মক্ষেত্রে নারীদের ঝুঁকির ব্যাপারে কিছু নীতিবচন ও স্বীকারোক্তি

প্রশংসা আল্লাহ্র নিমিত্তে। ছালাত ও সালাম বর্ষিত হৌক আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিজন এবং ছাহাবীদের উপর। পশ্চিমা ও অন্যান্যদের আহ্বানে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে ড. সালিভান বলেন, 'ইউরোপে দ্রুত অনৈতিকতা ছড়িয়ে পড়া এবং সকল পাপের প্রকৃত কারণ হ'ল পারিবারিক বিষয়ে নারীদের অবহেলা। অধিকন্তু পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কলকারখানা, গবেষণাগার, অফিসে কাজ করাও এর অন্যতম কারণ'।

আমেরিকার সমাজ বিশেষজ্ঞ, ড. ইডা এ্যালিন বলেন, 'গবেষণায় প্রমাণিত একজন মায়ের গৃহে অবস্থান এবং বাচ্চাদের লালন-পালন করা উচিত। পূর্ববর্তী এবং এই প্রজন্মের নৈতিক অবস্থানের মধ্যে বড় পার্থক্যের কারণ হ'ল, মা তার গৃহ ত্যাগ করা এবং তার সন্তানকে এমন ব্যক্তিদের কাছে রেখে যাওয়া যারা তাকে সঠিকভাবে লালন-পালন করতে পারে না'।

বিখ্যাত লেখিকা এ্যানি রোয়ার্ড 'দ্যা ইস্টার্ন মেইল' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে বলেন, 'আমাদের মেয়েদের কোন গবেষণাগারে কাজ করার চেয়ে বাড়ীতে পরিচারিকারূপে কাজ করা অধিকতর ভাল এবং কম দুর্দশাপূর্ণ। সেখানে সে ধূলাবালিতে মলিন হয়ে যায়, যা তার সৌন্দর্যকে নষ্ট করে।

আমাদের দেশগুলো যদি মুসলিম দেশগুলোর মত হ'ত যেখানে নম্রতা, ভদ্রতা ও পবিত্রতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি ইংল্যান্ডের জন্য লজ্জার বিষয় যে, তারা তাদের মেয়েদেরকে পুরুষদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে তাদেরকে পাপের দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিয়েছে। কেন আমরা মেয়েদেরকে কাজ করার জন্য এমন স্থান খুঁজে দিচ্ছি না, যা তাদের প্রকৃতির সাথে খাপ খায়? কেন আমরা মেয়েদের তাদের বাড়ীতে কাজ করতে এবং তাদের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার্থে শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য কর্মক্ষেত্র ছেড়ে দিচ্ছি না'?

এই সম্ভ্রান্ত রমণী এক শতাব্দী পূর্বে যা বলে গেছেন তা গভীরভাবে ভাবুন! ভেবে দেখুন লেখিকা যা বলেছেন এর চেয়ে পাশ্চাত্যে বর্তমান অবস্থা আরো করুণ।

বৃটেনের একটি অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তার বিদায় সম্ভাষণে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'এখানে আমার ষাট বছর পার হ'ল। আমার জীবনের এই বছরগুলোতে আমি সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, সফলতা লাভ করেছি এবং উন্নতি অর্জন করেছি। এছাড়াও সমাজের দৃষ্টিতে আমি বেশ ভাল ক্যারিয়ার গঠন করতে পেরেছি। যাহোক, প্রশ্নটি হ'ল, এতসব সফলতা লাভের পরেও কি আমি সুখী? প্রকৃতপক্ষে, না। নিশ্চয়ই একজন নারীর একমাত্র কাজ হ'ল একটি পরিবার গঠন করা এবং সেটা ছাড়া যদি সে অন্য কিছুতে প্রচেষ্টা চালায় তাহলে তার জীবনে তা মূল্যহীন হবে'।

প্রকৃতপক্ষেই, ইউরোপে পারিবারিক বিষয়ে নারীদের অবজ্ঞাই হ'ল সকল পাপ ও দ্রুত বিচ্ছিন্নতা ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

'যুগশ্রেষ্ঠ নারীগ্রন্থ' এই শিরোনামে বৃটিশ সংবাদপত্রে কিছু বিখ্যাত নারীর কর্মকাণ্ড বর্ণিত হয়। তারা তাদের সত্তাগত জীবনে ফিরে যেতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং লক্ষাধিক বেতনের চাকুরীর চেয়ে নারীত্ব ও মাতৃত্বকে প্রাধান্য দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, পেপসি কোলা কোম্পানীর নির্বাহী পরিচালক ব্রেনডা বার্নস চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং তার বাৎসরিক আয় ছিল আনুমানিক দুই লক্ষ ডলার। তিনি এতটাই দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, তার নিকট লক্ষাধিক ডলার ও চাকুরীর চেয়ে তার স্বামী ও তিন সন্তান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। তিনি তার মনকে বুঝালেন, গৃহই হচ্ছে তার জন্য স্বাভাবিক জায়গা, যা তার সত্তাগত বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের সাথে খাপ খায়। পেপসি কোলা কোম্পানীর পরিচালকের পূর্বে যুক্তরাজ্যের কোকা কোলা কোম্পানীর সিইও বেনী হ্যাগনেস একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি একটি সন্তানের মা হ'তে চেয়েছিলেন। আরেকটি দৃষ্টান্ত হ'ল লিন্ডা কেসলি। তিনি (এল) ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক ছিলেন, যা নারীদের চাকুরীর ব্যাপারে সমর্থন দেওয়ার জন্য সুপিরিচিত ছিল। তিনি ঐসকল নারীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন যারা কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদে ছিল এবং বেশ ভাল বেতন পেত। ব্রেনডা বার্নস সবার মাঝে একটি ঝোঁক সৃষ্টি করেছিল যখন সে ঘোষণা করে, 'আমি আমার চাকুরী ছেড়ে দেইনি, কারণ আমার সন্তানদের এর প্রয়োজন আছে'।

আমাদের কতিপয় নারীরা এটা পড়ে দেখবে কি? আমাদের নারীগণ যারা ওয়েস্টার্ন নারীদের মনোভাব অনুসরণ করতে চায়, তারা গৃহ ত্যাগ করে চাকুরী করার জন্য পীড়াপীড়ি করা কমাবে কি; যদিও তারা পেপসি বা কোকা কোলা কোম্পানীর ম্যানেজার নয়?

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক সংগঠন একটি নতুন জরিপ চালিয়েছে। এটা নমুনা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি প্রদেশের নর-নারীকে উপস্থাপন করেছে। জরিপে প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় আশিভাগ আমেরিকান নারী সন্তান ও পারিবারের যত্ন নেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়িতে অবস্থান করাকে প্রাধান্য দেয়।

ন্যাশনাল ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ এন্ড স্ট্যাটিসটিকসের সামাজিক গবেষণার ফলাফল নিশ্চিত করেছে, ইতালীয় নারীগণ কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের চেয়ে একজন গৃহিণী হ'তে অধিক পছন্দ করেন। এছাড়াও ইউরোপের পাঁচটি দেশ (ইতালী, ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানী ও স্পেন) কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় ঘোষিত হয়েছে,

ইতালীয় নারীগণ কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা মন্ত্রীর পদ বা রাষ্ট্রদূত বা ব্যাংকের সভাপতি হওয়ার চেয়ে তার পরিবারের দেখাশোনা করায় অধিক খুশী ও আশাবাদী। এছাড়াও তারা সফল কর্মজীবি নারী হওয়ার চেয়ে ভাল মা হ'তে অধিক পসন্দ করেন। গবেষণা প্রকাশ করে যে, ইতালীর একজন কর্মজীবি নারী চাকুরী করাকে শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের একটি মাধ্যম মনে করে। প্রথমত, পারিবারিক সাক্ষাতকালীন অনুষ্ঠান বা যখন তার স্বামী পরিবারের জন্য সময় দিতে পারে, ঐ সময় সে তার চাকুরীকে উপেক্ষা করে। ইতালীর প্রায় ছত্রিশ শতাংশ কর্মজীবী নারী ঘোষণা করেছেন, তাদের কর্মদক্ষতার চেয়ে তারা চাকুরীক্ষেত্রে কম যোগদান করেন। কাজেই কিছুসংখ্যক নারী চাকুরী থেকে দূরে থাকে না, তবে এমন নারীদের হার ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে ১৯ শতাংশের বেশী নয়। অধিকন্তু ৩৮ ভাগ নারী কর্মক্ষেত্রে উত্ত্যক্ত হওয়ার ভয়ে থাকে এবং ৬৪ ভাগ নারী তাদের স্বামীদের বাৎসরিক আয়ের অর্ধেক পরিবারেই বের করে আনতে পারে। ইতালীর ৯৫ শতাংশেরও অধিক নারী নিশ্চিত করেছে, পারিবারিক মূল্যবোধে তাদের গভীর বিশ্বাস রয়েছে এবং চাকুরীর জন্য পীড়াপীড়ি করাটা হ'ল তাদের পরিবারের সমস্যাগুলো থেকে এক প্রকার পলায়ন করার নামান্তর।

ফার্ডিন্যান্ড পোর্টম্যান, জার্মান নারীদের ব্যাপারে দ্যা হেরল্ড ট্রিবিউন এ লিখেছেন, চাকুরী থেকে দূরে থাকার পিছনে জার্মান নারীদের কারণ হ'ল পুরুষ, সন্তান ও গৃহের প্রতি ঝোঁক। তিনি বলেন, সন্তান ও রন্ধনশালাই হ'ল জার্মান সমাজে নারীদের ঐতিহ্যগত অবস্থান। আমরা জার্মান সমাজে নারীদের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারি। পাশ্চাত্যের জার্মান বাণিজ্যিক কেন্দ্রের সর্বোচ্চ পদগুলো যা দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক শক্তির মূলে রয়েছে, যেখানে নারীদের ভূমিকা এককথায় এভাবে বিবৃত করতে পারি যে, সেখানে নারীদের কোন অবস্থান নেই।

জর্জ বলেন, 'নারীগণ মা বা গৃহিণী হ'তে পসন্দ করার কারণে অনেক ভাল প্রশাসনিক দক্ষতা নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও কোম্পানী তাদেরকে একটি উচ্চপদে পদোন্নতি দিতে ইতঃস্তত বোধ করে। কারণ তারা হয়ত সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং এইভাবে চাকুরী ছেড়ে দিতে পারে'।

প্রাচ্যের কিছু মুসলিম দেশ ভ্রমণ করার পর ফ্রান্সের একজন উকিল ক্রিস্টিন বলেন, 'আমি বৈরূত, দামেশক, আম্মান এবং বাগদাদে সাত সপ্তাহ ভ্রমণ করেছি। এখন প্যারিসে ফিরে এসেছি। আমি কি দেখেছি? প্রকৃতপক্ষে আমি দেখেছি একজন লোক সকালে কাজের জন্য বের হয় এবং কঠোর পরিশ্রম করে। তারপর সন্ধ্যায় তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিকট যত্ন, হৃদতা ও ভালোবাসা আর জীবিকা নিয়ে ফিরে আসে। এই দেশগুলোতে একজন নারীর সন্তান লালন-পালন করা ও স্বামীর যত্ন নেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। প্রাচ্যে একজন নারী ঘুমায়, স্বপ্ন দেখে, সে যা চায় অর্জন করে। কারণ তার স্বামী তাকে খাদ্য, ভালবাসা, আরাম ও সুখ দেয়। অন্যদিকে আমাদের দেশের নারীগণ সমতার জন্য সংগ্রাম করে আসলে সে কি অর্জন করেছে?

পাশ্চাত্যে ইউরোপের নারীদের দিকে লক্ষ্য করুন! আপনি দেখতে পাবেন, একজন নারী পণ্যের চেয়ে বেশী কিছু নয়। পুরুষ তাকে বলে, 'যাও তোমার জীবিকা অর্জন কর, কারণ তুমি সমতা চেয়েছ। তাই যেহেতু আমি কাজ করি, তোমারও কাজ করা উচিত যাতে আমরা একত্রে জীবিকা অর্জন করতে পারি'।

জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ ও পরিশ্রম করার কারণে নারী তার নারীত্ব ভুলে যায় এবং পুরুষ ভুলে যায় তার জীবনসঙ্গীকে। তাই জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

মেরিলিন মনরো যিনি তার সময়ের বিখ্যাত আবেদনময়ী অভিনেত্রী ছিলেন। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। যে গোয়েন্দা কর্মকর্তা তার এই আত্মহত্যার কেসটি তদন্ত করেছিলেন তিনি নিউইয়র্কের ম্যানহ্যাটন ব্যাংকে মনরোর গচ্ছিত একটি চিঠি দেখতে পান। চিঠির খামে তিনি মনরোর উইল লক্ষ্য করেন, চিঠিটি যেন তার মৃত্যুর আগে খোলা না হয়।

গোয়েন্দা দেখতে পান, চিঠিটি মেরিলিন মনরোর হস্তলিখিত। চিঠিটি ঐসব মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য যারা অভিনেত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে মনরোর উপদেশ অনুসন্ধিৎসু। তিনি তার চিঠিতে মেয়েদেরকে এবং যারা সিনেমায় অভিনেত্রী হ'তে ইচ্ছুক তাদের ব্যাপারে বলেন, 'প্রসিদ্ধ হওয়ার আকাংখা ত্যাগ করুন! লাইমলাইটের আড়ালে যারা প্রতারণা করে তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। আমি পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্থ নারী। আমি মা হ'তে পারিনি যদিও আমি নিজ আলয় এবং পারিবারিক সম্মানজনক জীবন পছন্দ করি। পারিবারিক জীবনই হ'ল একজন নারীর বরং মনুষ্যজাতির সুখ-শান্তির প্রতীক'।

বিখ্যাত ইংরেজ বিদ্বান স্যামুয়েল স্মাইলস যিনি ইংরেজ রেনেসাঁর অন্যতম দৃঢ় সমর্থক ছিলেন, তিনি বলেছেন, 'যে চলতি ধারার কারণে নারীকে চাকুরী করতে বাধ্য করা হয় তা মূলত পারিবারিক জীবনকে বিধ্বস্ত করে দেয়, তাতে এই চাকুরী অঢেল ধনদৌলত বয়ে আনুক না কেন। এই কারণে যে এটা পরিবারের মূল কাঠামোয় আঘাত হানে, সংসারের স্তম্ভ গুলো পৃথক করে দেয়, সামাজিক বন্ধন টুটে ফেলে এবং স্ত্রীকে স্বামী হ'তে ও শিশুদের আত্মীয়স্বজন হতে দূরে সরিয়ে নেয়। নারীদের কাজের ধরন বিশেষভাবে বদলে গেছে, যা কেবলমাত্র তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটিয়েছে। নারীদের প্রকৃত কাজ হ'ল গৃহস্থালির কাজে তদারকি করা যেমন গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখা, সন্তানদের লালন করা, প্রয়োজন অনুযায়ী সতর্কভাবে তাদের আয় থেকে খরচ করা। অন্যদিকে চাকুরী তার এ সকল দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেয়। এইভাবে পরিবার দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় পতিত হয় এবং ছেলেমেয়েরা ভাল স্বভাবের অধিকারী হয় না। যেহেতু তারা অবহেলায় বেড়ে উঠে। অধিকন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা শেষ হয়ে যায় এবং নারী একজন চমৎকার স্ত্রী ও মনোহর দয়িতার পরিবর্তে স্বামীর কাজ ও কষ্টের সহকর্মীতে পরিণত হয়। সে বিভিন্ন চাপের বশীভূত হয় যা তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিনয়, স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ ও নীতি-নৈতিকতা ইত্যাদি যা মূলত সদগুণের ভিত্তি তা লোপ করে'।

লগস উইকলি রেকর্ড সংবাদপত্র লন্ডন থেকে একটি নথিপত্র প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, 'নারীদের গৃহ ত্যাগ করে পুরুষের কাজ করাতেই মূল বিপর্যয় নিহিত। এই বিষয়টি নারীদেরকে পরিবার থেকে বিপথগামী হওয়ার সংখ্যা এবং অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। এভাবে তারা সমাজের জন্য বোঝা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পুরুষের বিপক্ষে নারীর প্রতিযোগিতা ধ্বংসের পথে পরিচালিত করছে। আপনি কি দেখেননি, যেভাবে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা এটাই কি নির্দেশ করে না যে, নারীর যে দায়িত্ব রয়েছে তা পুরুষের উপর আরোপ করা হয়নি এবং পুরুষের যেসব দায়িত্ব রয়েছে যা নারীর উপর আরোপ করা হয়নি?

একটি নতুন গবেষণা পুরাতন ধারণাকে সত্যায়ন করেছে। তা হ'ল, পুরুষ অধিকতর সুখী হয় যদি তার স্ত্রী গৃহেই থাকে। গবেষণায় বিবৃত হয়েছে, চাকুরী পদ পুরুষের জন্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা পূর্বে ভাবা হ'ত, তার চেয়েও বেশী তাকে হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। যাহোক যে পুরুষের স্ত্রী চাকুরী করে না সে অপেক্ষাকৃত কম বিষণ্নতায় ভোগে। লন্ডনে কুইন মেরী কলেজের মনস্তাত্ত্বিক বিভাগের একটি দল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষের স্ত্রী যে সীমিত সময়ের জন্য কাজ করে অথবা পরিবারের দেখাশোনা করার জন্য বাড়িতে থাকে, ঐ ব্যক্তি তাদের থেকে কম বিষণ্নতায় ভোগে যাদের স্ত্রীরা পূর্ণ সময়ের চাকুরী করে। অধিকন্তু যখন স্ত্রী পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব ছেড়ে দেয় এবং পূর্ণ সময়ের চাকুরীজীবী হিসেবে কাজ করে তার স্বামী অন্যদের তুলনায় অধিক হতাশাগ্রস্থ হয়। কার্যক্রমটি একটি দীর্ঘ গবেষণার অংশ উচ্চপদস্থ সহকর্মীদের তুলনায় যারা নিম্নপদে কাজ করে তাদের ক্রমবর্ধমান মানসিক রোগের কারণ শনাক্ত করে। প্রফেসর স্টিফেন স্টানসফিল্ড যিনি এই কার্যক্রমের পরিচালক তিনি বলেন, 'আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি চাকুরী ও সামাজিক জীবন, বিভিন্ন পদ ও বিষণ্নতার মাঝে যে সম্পর্ক আছে তা স্পষ্ট করে কিনা। এছাড়াও আমরা বিভিন্ন ধরনের চাপের গুরুত্ব এবং সামাজিক আনুকূল্য ও মন্দা অবস্থার মাঝে যে সম্পর্ক আছে তা তদন্ত করেছি'।

গবেষকরা সবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, যে ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদে আসীন থাকে সে পুরুষ বা নারী হোক, তার প্রচুর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগতি থাকে যা জীবনমানের উপর সরাসরি অবদান রাখে এবং বিষণ্নতা ও চাপ অবদমিত করতে সাহায্য করে। ব্যক্তি তার চাকুরীর উপর যে পরিসরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, যোগ্যতা প্রদর্শনে যতটুকু সহজলভ্য সুযোগ পায় এবং কাজের ক্রমাগত পরিবর্তন ইত্যাদি উচ্চপদস্থ সহকর্মীদের তুলনায় যারা নিম্নপদে কাজ করে তাদের মাঝে ক্রমাগত হাতাশায় ভোগার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

ড. ভিকি কাতিল এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'সামাজিক নেটওয়ার্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে রমণী চাকুরী করবেনা বলে মনস্থ করে এবং বাড়ীতে থাকতে পসন্দ করে সে পরিবারের দায়িত্ব পালনে ও সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে'।

অন্যান্য উপাদানের মাঝে বিষণ্নতা বৃদ্ধিতে যা কাজ করে তা হ'ল চাকুরীক্ষেত্রে নিম্নপদ। তারা বিষণ্নতায় ভুগে। কারণ তারা উপলব্ধি করে, কর্মক্ষেত্রে তাদের পদোন্নতি হচ্ছে না অথবা প্রয়োজনীয় বস্তুর বোঝা সেই মুহূর্তে বাড়ছে যখন তাদের সেই প্রয়োজন মেটাতে তাদের পসন্দের স্বাধীনতা থাকছে না।

এছাড়াও গবেষণায় উদঘাটিত হয় যে, নারীরা নিম্ন বা মাঝারী যে পদেই থাকুক তারা অধিক হতোদম্যের স্বীকার হয়। এটা এ কারণে যে, বাড়ীতে বা কর্মস্থলে যেখানেই হোক তারা তাদের চারপাশের পরিবেশের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। পুরুষের ক্ষেত্রে, যখন সে কর্মক্ষেত্রে মাঝারি পদে বহাল থাকে যেখানে মূলত তার পর্যাপ্ত কর্তৃত্ব থাকে না, তিনি অধিক বিষণ্নতার স্বীকার হবেন। একই বিষয় পুরুষদের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে, যিনি উচ্চ বা মাঝারি পদে আসীন অনুভব করেন, বাড়িতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না।

প্রফেসর স্টানসফিল্ড আরো বলেন, 'আমরা এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছি, যেসব নারীদের স্বামীগণ চাকুরীচ্যুত হন তারা অধিক মাত্রায় হতাশার স্বীকার হন। অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্ত স্বামীদের ব্যাপারে তাদের মাঝে হতাশার উদ্রেক হয় না' *(বিবিসি)*।

আরব্য নীতিবচন ও স্বীকারোক্তি :

ছবহী ইসমাঈল কুয়েতের রাজনৈতিক সংবাদপত্রে লিখেছেন, 'তার (নারী) মাঝে প্রাণোচ্ছলতা, কর্মক্ষমতা ও উচ্চাকাঙ্খা আছে, যা অনেক পুরুষের মাঝেই থাকে না। যেহেতু তাদের উচ্চাকাঙ্খা স্নাতক ডিগ্রী অর্জন ও চাকুরী পাওয়ার পরই শেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে সে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ পথে স্নাতকোত্তর ও পিএইচ.ডি. অর্জনের লক্ষ্যে সফলভাবে চলতে থাকে'।

ম্যানহল আস-সারাফ যিনি দর্শনে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছেন জোর দিয়ে এই কথাগুলো বিবৃত করেছিলেন।

যাহোক, চমকপ্রদ বিষয়টি তার নিশ্চয়তায় নিহিত, সেটা হ'ল একজন নারী এখনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত নয়। একজন নারীর তার স্বামীর জন্য বাড়িতে থাকা যরূরী, কাজ থেকে বাড়ীতে ফেরার পর তার স্ত্রীর আব্যশকতা রয়েছে। এছাড়াও বাচ্চাদের লালন-পালন করা ও তাদের দেখাশোনা করার জন্য মায়ের দরকার আছে। আমি সবসময় এই ইঙ্গিত দেই যে, বর্তমান অবস্থা ভ্রমপূর্ণ। এটা কখনও যৌক্তিক নয় যে, একজন নারী অন্যকিছুর জন্য তার সন্তানদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে তা আর যা কিছুই হোক না কেন। সন্তান ও পরিবারকে হারিয়ে কোন কিছু অর্জিত হ'তে পারে না। যদি নারী তার রাজ্য ও অধীনস্তদের ভালো না বাসে যা মূলত তারই অংশবিশেষ, তাহলে আমরা তাকে আমাদের স্বার্থ রক্ষায় কিরূপে বিশ্বাস করতে পারি?

আস-সারাফ বলেই যাচ্ছিলেন, ‘একজন নারীর ভোটদানের অধিকার পাওয়া সম্ভব এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি এমন একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন যিনি তার অধিকার আদায়ের বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করবেন। তারপর তিনি এসব বিষয় পরিচালনার ভার পুরুষের হাতে ছেড়ে দিবেন। তা এই জন্যই যে, দায়িত্বের সাথে প্রতিনিধির সঙ্গে পরামর্শ সভায় তার উপস্থিতি, তার নারীত্ব ও আব্রু কেড়ে নিতে পারে, এমনকি তিনি অবিবাহিত হ’লেও এই বিষয়টি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি মনে করি যারা নারীদের অধিকার আদায়ে ডাক দেয় তারা শুধুমাত্র খ্যাতির অন্বেষী ছাড়া কিছু নয়। তাদের উচিত প্রার্থীর ব্যাপারে কথা বলার পূর্বে নিজেদেরকে প্রশ্ন করা যে, আসলেই তাদের অধিকার প্রদান করার ক্ষমতা আছে না নেই? অধিকন্তু উত্তর প্রদানে তাদের সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। যা কোনরূপ সন্দেহ ছাড়াই তাদের পক্ষ থেকে নেতিবাচক জবাব বের হয়ে আসবে। এই দায়িত্ব সাধারণত একজন নারী যে দায়িত্ব পালন করে তার চেয়ে অনেক গুরুতর। এটা নারীদের অবস্থাকে খর্ব করা নয়, বরং এই জন্য যে, তাদেরকে এই দায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; বরঞ্চ নিঃসন্দেহে তাদেরকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে’।

আস-সারাফ এর সাথে আরো যোগ করেন, যদি তার ভোটদানের অধিকার থাকে তিনি একজন নারীকে নয়, বরং পুরুষকে ভোট দিবেন। এই পরিস্থিতি নারীদের প্রতিকূলে নয়, বরঞ্চ নিঃসন্দেহে তার অনুকূলে। কারণ আমি চাই একজন নারী বাড়ীতেই অবস্থান করুক এবং আমি আশা করি আমার এই চিন্তাধারা পুরাতন বা সংকীর্ণ মনের বলে অভিযুক্ত হবে না। আমি আশা করি, নারীগণ অন্যদের মতামতও গ্রহণ করে। আর তা হ’ল নারীকে একজন প্রেমময়ী স্ত্রী ও মমতাপূর্ণ মা হিসেবে দরকার, যে তার পরিবারের দেখাশোনা করবে। সমাজের সমস্যাগুলো দূর করার জন্য নারীদের তাদের মিলনায়তনে বিষয়টি গভীরভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। আস-সারাফ নারী রাজনৈতিক কর্মীদের কানে এভাবে গুঞ্জন সৃষ্টি করেছেন, এই পথ এখনও অনেক দীর্ঘ এবং নারীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যা তারা সম্পাদন করতে পারে। একজন নারীর তার সমস্যা সমাধানের জন্য অনুসন্ধান করা উচিত এবং সংসদীয় বিতর্কে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। যেখানে তার সিদ্ধান্ত বিবেচনায় নেওয়া হ’তে পারে অথবা নাও হ’তে পারে।

এবারে একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের কথা বলব, ইহসান আব্দুল কুদ্দূস যিনি তার উপন্যাসের মাধ্যমে সাহিত্যিক মহলে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছিলেন। উপন্যাসটি হ’ল, নারীর বাহিরে যাওয়া, পুরুষদের সংসর্গে মেশা ও তাদের সাথে ক্লাব ও পার্টিতে নাচা। ১৮.০১.১৯৮৯ তারিখে উপন্যাসটির প্রকাশকালে কুয়েতী সংবাদপত্র ‘আল-আনবা’-এর সাথে সাক্ষাৎকার প্রদানকালে তিনি বলেন, ‘আমি কখনও একজন কর্মজীবী নারীকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করি না। এটাই আমার নিকট প্রতিভাত হয়েছে। আমি প্রাথমিকভাবে এটাই বুঝতে পেরেছি নারীদের জন্য গৃহেই অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে’।

লায়লা আল-উসমান বলেন, ‘পারিবারিক চৌহদ্দি পেরিয়ে একজন নারীর কর্মজীবী হওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। তবে আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমার পরিবার, আমার পরিবার, এবং আমার পরিবার। সবশেষে অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের কথা আসবে’। মহান আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন।

তথ্যসূত্র : *www.saaid.net* ও *www.islamway.net থেকে সংগৃহীত।*

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর মুখপত্র **‘তাওহীদের ডাক’**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ৩য় পর্যায় (ক)

دور الجديد : المرحلة الثالثة (الف)

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (السيد نذير حسين الدهلوى) এলাকাভিত্তিক উল্লেখযোগ্য ছাত্র মণ্ডলী :

যেলা সারেন : ১। মৌলবী আবু নছর আবদুল গাফ্ফার মেহদানওয়াঁ (মৃ. ১৩১৫ হিঃ)। ইনি জীবনীকার ফযল হুসাইনের আপন চাচাতো ভাই ছিলেন। সারেন যেলার আহলেহাদীছের নেতা ছিলেন। ২। মৌলবী ইহসানুল্লাহ (ইনি সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ ছিলেন)। এতদসহ মোট আট জন।

যেলা দারভাঙ্গা : ১। হাফেয মাওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদী (১২৭০-১৩৩৬/১৮৫৫-১৯১৮)। 'হুসনুল বায়ান' -এর খ্যাতনামা লেখক ও মুর্শিদাবাদ যেলার মাড্ডা বাহাছের স্বনামধন্য মুনাযির ছিলেন। মোযাফ্ফরপুর, দারভাঙ্গা, দিনাজপুর ও বাংলাদেশ এলাকার বহু জনপদের শ্রদ্ধেয় আহলেহাদীছ নেতা, বাহাছ ও মুনাযারায় দক্ষ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী আলিম ছিলেন। ২। তাঁর ভাই মাওলানা আব্দুর রহীম রহীমাবাদী। ৩। মৌলবী আলতাফ হুসাইন ফাযিলপুরীসহ মোট ১০ জন।

যেলা ছাহেবগঞ্জ : ১। মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক ২। মৌলবী তাবারক হুসাইন ৩। মৌলবী শের মুহাম্মাদ ৪। মৌলবী মুহাম্মাদ যাকির ৫। মৌলবী আবদুস সাত্তার।

এতদ্ব্যতীত বিহার প্রদেশের মুযাফ্ফরপুর, মোতীহারী, মুংগের প্রভৃতি যেলায় যথাক্রমে ৩, ১ ও ৩ জন ছাত্রের নামসহ সর্বমোট ১১৪ জন বিহারী ছাত্রের নাম আছে।

বঙ্গদেশে (বাংলাদেশ ৩২ ও পঃ বঙ্গ ১৬=৪৮ জন) :

যেলা চট্টগ্রাম : ১। মৌলবী বখশী আলী ২। মৌলবী হায়দার আলী ইসলামাবাদী ৩। মৌলবী আসাদ আলী ৪। মৌলবী হাসানুয্যামান ৫। মৌলবী আবদুল ফাত্তাহ ৬। মৌলবী বখশিষ আলী ৭। মৌলবী মুণীরুদ্দীন বিন মৌলবী হাসান আলী ইসলামাবাদী।

যেলা সিলেট : ১। মৌলবী মুহাম্মাদ তাহের ২। মৌলবী হাসান আলী ৩। মৌলবী আব্দুল বারী ৪। মৌলবী মুহাম্মাদ ইয়াকূব।

যেলা ঢাকা : ১। মৌলবী নাছীরুদ্দীন ২। মৌলবী আব্দুল্লাহ ৩। মৌলবী আব্দুল গফুর ৪। মৌলবী ইবরাহীম ৫। মৌলবী হায়দার আলী।

যেলা রংপুর : ১। মৌলবী আব্দুল হালীম ২। মৌলবী আব্দুল হাদী (মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী-এর পিতা) ৩। মৌলবী যহীরুদ্দীন ৪। মৌলবী আতাউল্লাহ।

যেলা দিনাজপুর : ১। মৌলবী আব্দুল বাসেত ২। মৌলবী আব্দুল হামীদ ৩। মৌলবী আমানাতুল্লাহ ৪। মৌলবী মুহাম্মাদ হুসাইন ৫। মৌলবী ঈসা ৬। মৌলবী আব্দুস মালেক ৭। মৌলবী আব্দুস সাঈদ।

যেলা নাছীরাবাদ : (মোমেনশাহী) : মৌলবী খাজা আহমাদ।

যেলা রাজশাহী : ১। মৌলবী মুহাম্মাদ (জামিরা) ২। মৌলবী রহীম বখ্শ ৩। মৌলবী আছগার আলী ৪। মৌলবী মাওলা।

যেলা বর্ধমান : ১। মৌলবী মুহাম্মাদ বিন যিল্লুর রহীম ২। আব্দুর রহমান বিন যিল্লুর রহীম ৩। মৌলবী নেয়ামাতুল্লাহ ৪। ফযলে করীম ৫। আব্দুর রহীম ৬। ইহসান করীম ৭। মৌলবী ইসহাক্ব

যেলা মুর্শিদাবাদ : ১। মৌলবী সলীমুদ্দীন ২। মৌলবী আব্দুল আযীয ৩। মৌলবী নাজমুদ্দীন ৪। মৌলবী ইয়াকূব আলী ৫। মৌলবী আবু মুহাম্মাদ হেফাযাতুল্লাহ ৬। মৌলবী ইব্রাহীম দেবকুন্ডী (বেলডাঙ্গা, মাওলানা মাওলা বখ্শ নদভীর পিতা)।

কলিকাতা : মৌলবী আয়নুদ্দীন (১২৯৭-১৩৪০ বাং) মেটিয়াবুরুজ, হাফেয মাওলানা আয়নুল বারীর দাদা।

যেলা নদীয়া : মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক বিন মৌলবী খাজা আহমাদ ২। মৌলবী তোরাব আলী ওরফে খাকী শাহ।

০ আসাম : মৌলবী সা'আদুল্লাহ (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ)।

০ ব্রহ্মদেশ : মৌলবী মুহাম্মাদ ওমর ২। মৌলবী আমীরুদ্দীন।

০ সিন্ধু : মৌলবী মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী (খ্যাতনামা লেখক) ২। মৌলবী কুদরাতুল্লাহ ৩। মৌলবী আব্দুল ওয়াহেদ ৪। মৌলবী আবু তোরাব রুশ্দুল্লাহ।

০ পাঞ্জাব : মৌলবী শামসুদ্দীন (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ) ২। মৌলবী ওবায়দুল্লাহ (তুহফাতুল হিন্দ ও তুহফাতুল ইখ্ওয়ান-এর লেখক) ৩। মৌলবী আব্দুল ওয়াহ্হাব (১২৮১-১৩৫১/১৮৬৩-১৯৩২) 'জামা'আতে গোলাবায়ে আহ্লেহাদীছ' -এর প্রতিষ্ঠাতা। দিল্লীর ছদরবাযারে 'দারুল কিতাবে ওয়াস্ সুন্নাহ' নামে একটি মাদরাসা কায়েম করেন। তাঁর বহু ছাত্র ও অনুসারী রয়েছে) ৪। মৌলবী অলি মুহাম্মাদ ৫। মৌলবী আব্দুল্লাহ গযনভী (১২৩০-৯৮ হিঃ/ ১৮১৪-৮০ খৃঃ) খ্যাতনামা আফগান আহলেহাদীছ নেতা ও ছূফী মুহাদ্দিছ ছিলেন ৬। তাঁর পুত্র মৌলবী মুহাম্মাদ গযনভী, তাফসীরে জামেউল বায়ান-এর মধ্যে তাঁর লিখিত টীকা রয়েছে। ৭। অন্যতম পুত্র মৌলবী আব্দুল জাব্বার গযনভী অমৃতসরী (ইনি পিতা আব্দুল্লাহ গযনভীর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন)। ৮। মৌলবী আবুল ওফা

ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) খ্যাতনামা আহলেহাদীছ নেতা, 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্স' -এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, উর্দূ সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' পত্রিকার সম্পাদক, তাফসীরে ছানাঈসহ বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পুস্তিকার লেখক, ভারতবিখ্যাত মুনাযির ও কাদিয়ানী বিজরী, 'শেরে পাঞ্জাব' বলে খ্যাত স্বনামধন্য আলিম)। ৯। ক্বাযী মাহফূযুল্লাহ (ইনি তাফসীরে মাযহারী প্রণেতা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী-এর নাতি) ১০। মৌলবী মুহাম্মাদ শাহ পাকপটনী পাঞ্জাবী ('তানভীরুল হক'-এর লেখক। এ বইয়ের প্রতিবাদেই মিয়াঁ ছাহেব 'মি'য়ারুল হক' লেখেন) ১১। মৌলবী তেলা মুহাম্মাদ খান, মক্কায় মৃত্যু ১৩১০ হিজরী; ইনি উঁচুদরের আলিম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন (পরে ঢাকার বাশিন্দা হন। ১২। মোল্লা ছিদ্দীক পেশাওয়ারী (খ্যাতনামা ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছ হওয়ার সাথে সাথে উঁচুদরের উছূলী ছিলেন। মুসাল্লাহমুছ ছুবূত, মুগতানামুল হুছূল প্রভৃতির তিনি হাফেয ছিলেন বলা চলে। এতদ্ব্যতীত নূরুল আনওয়ার, তাওযীহ, আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, মুছাফ্ফা, মাহছূল, হুসামী, প্রভৃতি উছূলের কিতাবসমূহ তাঁর নখদর্পনে ছিল। এতদসহ সারা পাঞ্জাবে, পেশাওয়ারে ও ঝিলামে মোট ৬৩ জন ছাত্রের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত সূরতে ১ জন, গুজরাটে ২ জন এবং মাদ্রাজে ২ জন ছাত্রের নাম আছে।

যেলা দিল্লী : মাওলানা সাইয়িদ শরীফ হুসাইন (মিয়াঁ ছাহেবের পুত্র, মৃ. ১৩০৪ হিঃ) ২। মৌলবী সাইয়িদ আহমাদ হাসান (ইনি تلخيص الانتظار فيما بني عليه الانتصار) নামক বিখ্যাত পুস্তিকার লেখক। পুস্তিকাটি মিয়াঁ ছাহেব প্রণীত 'মি'য়ারুল হক' (معيار الحق) -এর প্রতিবাদে লেখা 'ইন্তিছারুল হক' (إنتصار الحق) -এর বিরুদ্ধে মাত্র দশ দিনের মধ্যে লিখে ও ছেপে প্রকাশ করা হয় এবং ১২৯০ হিজরীর ২৫শে জমাদিউছ ছানীতে লেখকের নামে প্রেরণ করা হয়। ৩। মৌলবী আব্দুল হক (তাফসীরে হাক্কানী-এর প্রণেতা ৪। শামসুল ওলামা মৌলবী ডেপুটি নাযীর আহমাদ এল.এল.ডি বিজনৌরী দেহলভী (ইনি কুরআন মজীদের অনুবাদক এবং نبات النعش, توبة النصوح ইত্যাদি বইসমূহের লেখক) ৫। মৌলবী মীর মুহাম্মাদ (দিল্লী জামে মসজিদের ইমাম) ৬। মৌলবী রহীম বখ্শ (দিল্লীর ফতেহপুরী জামে মসজিদের ইমাম ৭। হাফেয মৌলবী আব্দুল ওয়াহ্হাব নাবীনা (হাদীছেল অন্ধ হাফেয ও খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম) ৮। মৌলবী আব্দুল কাদের (ইমাম মসজিদে কেল্লাঁ ওরফে কালী মসজিদ) এতদসহ মোট ২২ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

যেলা ডেরা ইসমাঈল খাঁ : মৌলবী ওবায়দুল্লাহ।

যেলা রাওয়ালপিন্ডি : মৌলবী আব্দুল্লাহ ফতেহজংগী ২। মৌলবী আব্দুছ ছামাদ বুরহানবী ৩। মৌলবী হেদায়াতুল্লাহ।

যেলা শিয়ালকোট : মৌলবী মুহাম্মাদ শিয়ালকোটী ২। মৌলবী মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী (মৃ. ১৩৭৬/১৯৫৬, উর্দূ 'তারীখে আহলেহাদীছ' -এর লেখক) ৩। মৌলবী খোদাবখ্শ ৪। মৌলবী আবুল হাসান ৫। মৌলবী ইবরাহীম হামীদপুরী।

যেলা গুরুদাসপুর : মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী (পাঞ্জাবের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ নেতা, মাসিক ইশা'আতুস সুন্নাহ্-এর মালিক ও সম্পাদক, منح الباري في ترجيح صحيح البخاري -এর স্বনামধন্য রচয়িতা, মিয়াঁ ছাহেবের খ্যাতিমান ছাত্র ও নিজে অগণিত ছাত্রের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক) ২। মৌলবী মীর হাসান শাহ ৩। মৌলবী মুহাম্মাদ ওছমান বিন মৌলবী নিযামুদ্দীন ফতেহগড়ী ৪ ও ৫। তাঁর পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে মৌলবী মুহাম্মাদ আযম ও মৌলবী মুহাম্মাদ ফাযিল।

যেলা গুজরানওয়ালা : মৌলবী আব্দুল হামীদ বিন আব্দুল্লাহ সোহদারী ২। মৌলবী গোলাম নবী সোহদারী ৩। মৌলবী আহমাদ আলী ৪। মৌলবী মুহাম্মাদ (কেল্লা মিয়াঁ শংকর)। এতদসহ মোট ৮ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

যেলা লাহোর : মৌলবী ফযলে হক ২ । মৌলবী রহীশ বখ্শ ৩। মৌলবী আহমাদ (শিক্ষক, মাদরাসা নু'মানিয়া) ৪। মৌলবী আব্দুল হাকীম ৫। মৌলবী ইসমাঈল ৬। মৌলবী কাযী যাফরুদ্দীন (শিক্ষক, দারুল উলূম লাহোর) এতদসহ মোট ১১ জনের নাম রয়েছে।

যেলা লুধিয়ানা : মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক ২। মোসাম্মাৎ ফযীলত যওজে মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক ৩। মোসাম্মাৎ উম্মে সালামাহ বিনতে মৌলবী মুহাম্মাদ ইসহাক ৪। মৌলবী হাফেয মুহাম্মাদ দাউদ সহ মোট ৬ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

যেলা মুলতান : মৌলবী শায়খ মুহাম্মাদ (সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেকার শাগরিদ) ২। মৌলবী আব্দুল ওয়াহ্হাব ৩। মৌলবী আব্দুত তাওয়াব সহ মোট ৭ জনের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

যেলা ওয়াযীরাবাদ : মৌলবী হায়দার আলী ২। মৌলবী আব্দুল কাদের ৩। হাফেয আব্দুল মান্নান (১২৬৭-১৩৩৪/১৮৫১-১৯১৫) খ্যাতনাম মুহাদ্দিছ ও মুদাররিস।

যেলা হাযারা : মোল্লা মুহাম্মাদ হুসাইন বিন আব্দুস সাত্তার (শারহে নুখবাহ-এর ভাষ্যকার) ২। মৌলবী ইউসুফ হুসাইন খানপুরী (খ্যাতনামা আলিম ও সাহিত্যিক) ৩। মৌলবী মুহাম্মাদ ইয়াসীন হাযারভীসহ মোট ৯ জনের নাম আছে।

এতদ্ব্যতীত মোযাফ্ফরাবাদে ১ জন, শাহপুরে ২ জন, ফিরোজপুরে ৪ জন, হুশিয়ারপুরে ২ জন, ফুরুকাহ-তে ১ জন এবং কাশ্মীরের মৌলবী আব্দুল আযীম (জন্মু)-এর নাম উল্লেখিত হয়েছে *(ক্রমশঃ)*।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩২৫-৩৩০]

যুবসমাজের কতিপয় সমস্যা

মূল : মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন
অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ

(১১তম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল'১৩-এর পর)

৫. কতিপয় যুবক ধারণা করে, ইসলাম মানুষের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং যাবতীয় শক্তিকে ধ্বংস করে ফেলে। ফলে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় এবং ইসলামকে পশ্চাদমুখী ধর্ম হিসাবে মনে করে। যে ধর্ম তাদের অনুসারীদেরকে পশ্চাতে নিয়ে যায় এবং তাদের ও উন্নতি-অগ্রগতির মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এই সমস্যার সমাধান : এই যুবকদের জন্য ইসলামের প্রকৃত স্বরূপের পর্দাকে উন্মোচন করা যারা নেতিবাচক ধারণা, জ্ঞানের স্বল্পতা অথবা একই সাথে উভয়টির কারণে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জানে না। কবি বলেছেন, 'আর যে ব্যক্তি অসুস্থার হেতু তিতো মুখের অধিকারী হবে, সে ঐ মুখে সুস্বাদু পানির স্বাদ তিতোই পাবে'।

ইসলাম স্বাধীনতকে সীমাবদ্ধকারী নয়। বরং তা স্বাধীনতাকে সুসমন্বিত করা এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী। যাতে একজন ব্যক্তিকে মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে তা অন্যদের স্বাধীনতার সাথে সংঘাতপূর্ণ না হয়। কেননা, যে ব্যক্তিই মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা চাইবে। তা অন্যদের স্বাধীনতা অনুযায়ী হ'তে হবে। এতে স্বাধীনতাসমূহের মাঝে সংঘর্ষ বেঁধে যাবে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বে ও ধ্বংস নেমে আসবে।

এজন্যই আল্লাহ ধর্মীয় বিধি-বিধানগুলিকে 'হুদূদ' (দণ্ডবিধি) নামকরণ করেছেন। আর যখন হুকুমটি নিষেধাজ্ঞামূলক হয় তখন আল্লাহ বলেছেন, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها 'এটাই আল্লাহ্র সীমা। অতএব তোমরা তার নিকটবর্তী হবে না' *(বাকারাহ ২/১৮৭)*। আর যদি হুকুমটি ইতিবাচক হয় তাহ'লে বলেছেন, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا 'এটাই আল্লাহর সীমা। অতএব তোমরা তা লংঙ্ঘন করবে না' *(বাকারাহ ২/২২৯)*।

কতিপয় ব্যক্তির ইসলাম কতৃক স্বাধীনতাকে সীমিত করার ধারণা এবং মহাপ্রজ্ঞাময় সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে দিকনির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছেন তার মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এই সমস্যার মূলত কোন কারণই নেই। কারণ ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলাবিধান এই বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি বাস্তব বিষয়। মানুষ এই বাস্তবমুখী ব্যবস্থাপনার প্রতি স্বভাবতঃই অনুগত। সে ক্ষুধা ও পিপাসার কতৃত্ব এবং খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত। আর এজন্যই সে পরিমাণ, ধরণ ও প্রকারগত দিক থেকে তার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে শৃংখলা বিধানে বাধ্য হয়। যাতে সে যেন খাদ্য গ্রহনে তার শরীরের সুস্থতা ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে।

তদ্রূপ সে বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে তার দেশের রীতি-নীতি আঁকড়ে ধরে সামাজি নিয়ম-কানুনের প্রতি বিনয়ী হয়। যেমন- সে পোষাকের আকার ও ধরন, বাড়ীর আকার-আকৃতি ও তার প্রকার, চলাচল ও ট্রাফিক নিয়মের প্রতি অনুগত হয়। আর যদি সে এগুলোর প্রতি অনুগত না হয়; তবে সে ব্যতিক্রমধর্মী (অসামাজিক) গণ্য হবে। বিচ্ছিন্ন ও প্রচলিত নিয়ম-নীতি থেকে দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য তা তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

অতএব পুরো জীবনটাই নির্দিষ্ট সীমারেখার প্রতি অনুগত থাকে। যাতে সকল বিষয় উদ্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাবমান হয়। উদাহরণস্বরূপ, সমাজ সংস্কার ও বিশৃংখলা রোধের জন্য যদি সামাজিক নিয়ম-নীতির প্রতি আবশ্যিকভাবে অনুগত থাকতে হয় এবং কোন নাগরিক এতে কোন বিরক্ত না হয় তাহলে মুসলিম উম্মাহর সংস্কারের জন্য অবশ্যই শারঈ নিয়ম-নীতির প্রতি অনুগত থাকতে হবে।

তাহ'লে কতিপয় ব্যক্তি কিভাবে এ ব্যাপারে নাখোশ হয় এবং শরী'আতকে স্বাধীনতা সংকুচিতকারীরূপে দেখে? নিশ্চয়ই এটি স্পষ্ট অপবাদ, বাতিল ও ধ্যাণ-ধারণা।

তেমনিভাবে ইসলাম ক্ষমতা বিনষ্টকারী নয়। বরং তা চিন্তাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক সকল ক্ষমতা বিকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র।

ইসলাম চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার দিকে আহবান জানায়। যেন মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার বোধশক্তি ও ধ্যান-ধারণাকে উন্নত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا 'বল! আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করছি যে, তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দুই দুই জন কিংবা এক একজন করে দাঁড়াও। অতঃপর চিন্তা কর' *(সাবা ৩৪/৪৬)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ 'হে নবী বলে দাও! তোমরা অবলোকন কর, কি কি বস্তু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে' *(ইউনুস ১০/১০১)*।

ইসলাম শুধু চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার প্রতি আহ্বান জানিয়েই ক্ষ্যান্ত হয় না। বরং যারা উপলব্ধি করে না, গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের সমালোচনা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ 'তারা কি দেখেনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সকল বস্তু হ'তে'? *(আ'রাফ ৭/১৮৫)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى 'তারা কি নিজেরা ভেবে দেখেনি যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও এক নির্দিষ্টকালের জন্য?' *(রূম ৩০/৮)*।

তিনি আরো বলেন, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ 'আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি। তাকে তার জন্মগত অবস্থায় ফিরিয়ে দেই। তবুও কি তারা অনুধাবন করে না'? *(ইয়াসীন ৩৬/৬৮)*।

গবেষণা ও চিন্তা করার আদেশ প্রদান বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তার দ্বারকে উন্মোচন করে, অন্য কিছুই নয়। এরপরও কিভাবে কতিপয় যুবকরা বলে যে, ইসলাম (শারীরিক এবং মানসিক) শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়? আল্লাহ বলেছেন, كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً 'কত উদ্ধতপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ হ'তে নিঃসৃত হয়! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে' *(কাহাফ ১৮/৫)*।

ইসলাম মুসলমানদের জন্য ঐ সকল ভোগের বস্তুকে বৈধ ঘোষণা করেছে, যাতে ব্যক্তির শরীরে বা দ্বীনে বা বুদ্ধিমত্তায় ক্ষতিকর কিছু নেই।

ইসলাম সকল প্রকার উৎকৃষ্ট বস্তু হ'তে খাদ্য ও পানীয় হালাল করেছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ 'হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি সেই পবিত্র বস্তু হ'তে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 'আর তোমরা খাও ও পান কর এবং অপচয় কর না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীকে ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

আর প্রজ্ঞা ও স্বভাবের দাবী অনুযায়ী ইসলাম সবধরনের পোষাক-পরিচ্ছদকে হালাল করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ- 'হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের উপর এমন পোষাক নাযিল করেছি, যা তোমার লজ্জাস্থান আবৃত করে ও অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার পরিচ্ছদ। আর অবতীর্ণ করেছি তাক্বওয়াপূর্ণ পোষাক। যা সর্বোত্তম পোষাক' *(আ'রাফ ৭/২৬)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ- 'তুমি জিজ্ঞেস কর যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তাকে কে নিষিদ্ধ করেছে? তুমি বলে দাও! এসব বস্তু পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য। ক্বিয়ামতের দিবসে বিশেষ করে তাদের জন্যই' *(আ'রাফ ৭/৩২)*।

আর শারঈ বিবাহের মাধ্যমে মহিলাদের উপভোগকে হালাল করেছে। আল্লাহ বলেছেন, فَانْكِحُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً 'নারীদের মধ্য হ'তে তোমাদের মনমত দুই দুই ও তিন তিন এবং চার চারটিকে বিবাহ কর। আর যদি ন্যায় বিচার করতে না পারার আশঙ্কা কর, তাহ'লে একজন (একজনকে বিবাহ কর)' *(নিসা ৪/৩)*।

আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম তার অনুসারীদের শক্তি-সামর্থ্যকে ধ্বংস করেনি। বরং তাদের জন্য সকল প্রকার উপার্জিত ন্যায্য রপ্তানিদ্রব্যকে সন্তুষ্টচিত্তে হালাল বলেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

তিনি আরও বলেছেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ 'তিনিই যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে চলাচলের উপযোগী করেছেন। অতএব তোমরা এর দিগন্তে ও রাস্তাসমূহে বিচরণ কর। আর তোমরা তাঁর রিযক্ব হ'তে আহার কর। এবং পুনরুত্থান তো তারই দিকে হবে' *(মুলক ৬৭/১৫)*। এছাড়াও তিনি বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ 'যখন ছালাত শেষ হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে। আর আল্লাহ্র অনুগ্রহ হ'তে অনুসন্ধান করবে' *(জুমু'আ ৬২/১০)*। এরপরও কি কতিপয় ব্যক্তির ধারণা ও উক্তি সঠিক হবে যে, ইসলাম ক্ষমতাকে ধ্বংস করেছে?

যে সমস্ত জটিলতা যুবকদের অন্তরে উদয় হয় : মৃত অন্তরে ধর্মবিরোধী চিন্তা-ভাবনা, কুমন্ত্রণা আসে না। কেননা তা মৃত অন্তরও ধ্বংসপ্রাপ্ত। মৃত অন্তর যে অবস্থায় রয়েছে তার চাইতে তার কাছ থেকে শয়তান অধিক কোন কিছু করার ইচ্ছা করে না। আর এজন্যই ইবনু মাসঊদ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলা হয়েছিল, নিশ্চয়ই ইহূদীরা বলে যে, ছালাতের মাঝে তাদেরকে কোন কুমন্ত্রনা দেয়া হয় না। অর্থাৎ ছালাতরত অবস্থায় কুমন্ত্রনা পেয়ে বসে না তাদেরকে তখন তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্তর নিয়ে শয়তান কি করবে।

আর কোন অন্তর যখন উজ্জীবিত থাকে এবং তাতে কিছুটা ঈমান থাকে; তখন শয়তান তাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। যাতে না আছে কোন নমনীয়তা। আর না আছে কোন নিশ্চলতা। অতঃপর শয়তান তার অন্তরে ধর্মবিরোধী কুমন্ত্রণাসমূহ ঢেলে দেয়। যদি বান্দা তার অনুগত হয়ে যায় তবে তা বিরাট কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি সে তার রবের, তার দ্বীনের ও আক্বীদার ব্যাপারে তাকে সন্দিগ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করে। যদি সে (শয়তান) অন্তরে দুর্বলতা ও পরাজয়ভাব লক্ষ্য করে তাহ'লে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। এমনকি শেষ পর্যন্ত

তাকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। আর যদি সে (শয়তান) হৃদয়ে শক্তি ও প্রতিরোধ লক্ষ্য করে তাহ'লে শয়তান তুচ্ছ হয়ে পশ্চাদপসারী ও লাঞ্ছিত, অপদস্থ অবস্থায় পরাজিত হয়।

এই সমস্ত কুমন্ত্রণাসমূহ যা শয়তান অন্তরে নিক্ষেপ করে; তা অন্তরে কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারে না যখন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত চিকিৎসাকে কাজে লাগায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ، يُعَرِّضُ بِالشَّيْءِ، لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ-

'ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কারো মনের মধ্যে এমন কিছু উদয় হয় যা মুখে প্রকাশ করার চেয়ে সে জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করে। তিনি বললেন, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি শয়তানের এ ধোঁকাকে কল্পনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন'।[১]

قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ،

'রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে তাঁর কিছু সংখ্যক ছাহাবী এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা আমাদের অন্তরে এমন কিছু অনুভব করি যা ব্যক্ত করাকে বা যা মুখে আনাকে আমরা গুরুতর মনে করি। আমরা এ ধরনের কথা মনে আসা অথবা পরস্পর আলোচনা করাকে পসন্দ করি না। তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ অনুভব করো? তারা বললেন হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ হ'ল স্পষ্ট ঈমানের লক্ষণ'।[২] আর খাঁটি ঈমানের অর্থ হ'ল, এই আপতিত কুমন্ত্রণাকে তোমাদের অস্বীকার করা ও তোমাদের সেটাকে বড় মনে করা তোমাদের ঈমানের কিছুই ক্ষতি করে না। বরং এটি এর প্রমাণ যে, তোমাদের ঈমান খাঁটি। যাকে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূষিত করে না।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ "

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের নিকটে শয়তান আসে এবং বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? এমনকি শেষ পর্যন্ত সে বলে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন সে ব্যাপারটি এ স্তরে গিয়ে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়, এবং বিরত হয়ে যায়।[৩] অন্য হাদীছে এসেছে, فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ সে যেন বলে, 'আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি'।[৪]

আবূ দাউদে বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

قَالَ فَقُولُوا: اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ

'(আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি) তিনি বলেন, তোমরা বলো আল্লাহ একক, আল্লাহ অভাবমুক্ত, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো সন্তান নন। আর কেউই তাঁর সাথে তুলনাযোগ্য নয়। তারপর যেনো বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং (আল্লাহ্র কাছে) শয়তানের (কুমন্ত্রণা) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে'।[৫]

এই হাদীছগুলিতে ছাহাবীগণ নবী (ছাঃ)-কে তাদের (কুমন্ত্রণা) ব্যাধির বিবরণ দিয়েছেন। আর তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন-

প্রথমতঃ এই সকল কুমন্ত্রণাগুলি হ'তে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা এবং এগুলিকে এমনভাবে ভুলে হওয়া যে সেগুলি আদৌ ছিল না। এগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে সঠিক চিন্তায় বিভোর থাকা।

দ্বিতীয়তঃ (الاستعاذة بلله منها, و من الشيطان الرجيم) বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

তৃতীয়তঃ (آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ) 'আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি' বলা।

চতুর্থতঃ (اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ثُمَّ يَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ : اعوذ بلله مِنَ الشَّيْطَانِ) : এই কথা বলা যে, 'আল্লাহ এক। আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন। তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন। আর তার সমতুল্য কেউ নেই'। সে যেন তার বামপার্শ্বে তিনবার থু থু ফেলে এবং বলে, 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি'।

তাক্বদীরের ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা : সার্বিকভাবে যেসব বিষয় যুবকদের মনে উদিত হয় এবং তারা হতভম্ব হয়ে থমকে যায়, তন্মধ্যে অন্যতম তাক্বদীরের বিষটি। কেননা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন ইসলামের অন্যতম একটি স্তম্ভ। যা ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হয় না। আর তা হ'ল, এই মর্মে ঈমান আনা যে, আকাশ ও যমীনে যা কিছু ঘটবে আল্লাহ তা'আলা তা অবগত আছেন এবং তিনি তার ভাগ্য

---

১. *আবুদাঊদ হা/৫১১২।*
২. *মুসলিম হা/২০৯।*
৩. *বুখারী হা/৩২৭৬; মুসলিম, হা/২১৩।*
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬।*
৫. *আবুদাঊদ হা/৪৭২২।*

নির্ধারণকারী। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 'তুমি কি জানো না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? অবশ্যই এসবই লিপিদ্ধ আছে এক কিতাবে। অবশ্যই এটা আল্লাহ্র উপরে সহজ' (*হজ্জ ২২/৭০*)।

নবী (ছাঃ) তাক্বদীর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া করতে নিষেধ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ، فَقَالَ : أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِيهِ-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। এমতাবস্থায় আমরা তাক্বদীর নিয়ে তর্ক করছিলাম। তারপর তিনি রেগে গেলেন। এমনকি তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল যেন তার দুই গালে ডালিম ছড়ানো হয়েছে। এরপর বললেন, তোমরা কি এ ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছ? নাকি আমি এই বিষয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হয়েছে যখন তারা এই বিষয়ে তর্ক করেছে। আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে ঝগড়া না করতে কঠোরভাবে বলছি'।[৬]

তাক্বদীর নিয়ে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক করা একজন ব্যক্তিকে এমন গোলকধাঁধায় পতিত করে, যা থেকে সে বের হ'তে সক্ষম হয় না। এ থেকে বেঁচে থাকার পথ হ'ল তুমি কল্যাণকর কাজে আগ্রহী হবে এবং সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাবে। যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বুদ্ধি ও উপলব্ধি দান করেছেন এবং তোমার নিকট রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আর তাদের সাথে আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا-

'আমরা রাসূলগণকে জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি। যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোনরূপ অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ না থাকে। আর আল্লাহ অতীব পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী' (*নিসা ৪/১৬৫*)।

যখন মহানবী (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার স্থান হয় জান্নাতে বা জাহান্নামে নিদিষ্ট করে রাখা হয়নি। এ কথা শুনে সবাই বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা আমল বাদ দিয়ে আমাদের লিখিত ভাগ্যের উপর কি ভরসা করব? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা আমল করতে থাক,কেননা যাকে যে আমালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। তার জন্য সৌভাগ্যের অধিকারী লোকদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে। তার জন্য দুর্ভাগ্যের অধিকারী লোকদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াতগুলি তেলাওয়াত করলেন।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى- وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى- وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى-

(৫) আর যে দান করেছে এবং মুত্তাক্বী হয়েছে। (৬) উত্তমকে সত্যায়ন করেছেন। (৭) অচিরেই তাকে আমি সহজ পথকে সুগম করে দিব (৮) পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করল ও বেপরোয়া হয়েছে (৯) আর উত্তমকে মিথ্যা মনে করল। (১০) অতি শীঘ্রই তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোরতার পথ। (*লাইল ৯২/৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০*)।[৬]

মহানবী (ছাঃ) তাদেরকে আমল করার আদেশ করলেন। এবং তাদের জন্য লিপিবদ্ধ বস্তুর (তাক্বদীর) উপর নির্ভরকে জায়েয করলেন না। কেননা জান্নাতীদের মধ্যে যার নাম লেখা হয়েছে সে জান্নাতবাসীর মতো আমল না করলে তাদের অন্তভুক্ত হবেন না। আর জাহান্নামীদের মধ্যে যার নাম লেখা হয়েছে সে তাদের মতো আমল না করলে তাদের অর্ন্তভুক্ত হবে না। আর আমল হয় ব্যক্তির সাধ্যানুসারে। কেননা সে নিজেই জানে যে, আল্লাহ তাকে কাজের ইচ্ছা ও তা সম্পাদন করার ক্ষমতা দান করেছেন। সে চাইলে তা করবে বা বর্জন করবে।

যেমন, একজন মানুষ সফরের পরকিল্পনা করে। অতঃপর সে ভ্রমণ করে সে অবস্থান করার সংকল্প করে। অতঃপর সে অবস্থান করে। সে আগুন দেখে ও সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সে তার নিকট কোন পসন্দনীয় জিনিস দেখে এবং তার দিকে অগ্রসর হয়। সুতরাং আনুগত্য ও নাফরমানির বিষয়টিও অনুরূপ। ব্যক্তি তা স্বেচ্ছায় সম্পাদন করে এবং স্বেচ্ছায় বর্জন করে।

কিছু মানুষের কাছে তাক্বদীরের বিষয়ে আরো দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়।

প্রথম প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি মনে করে যে সে একটি কাজ স্বেচ্ছায় করছে এবং স্বেচ্ছায় তা বর্জন করছে। অথচ সেটি সম্পাদন করা বা ত্যাগ করার ব্যাপারে বাধ্যতাকে করার বিষয়টি সে অনুভব করছে না। তাহ'লে এটি কিভাবে ঈমানের সাথে একত্রিত হবে যে, প্রত্যকটি বস্তু আল্লাহ্র ফায়ছালা ও তার নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী হয়?

এর জবাব হ'ল, যখন আমরা বান্দার কর্ম ও তার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি তখন তাকে দু'টি বিষয় থেকে উদ্ভূত পাই।

৬. *তিরমিযী হা/২১৩৩, তিনি হাদীছটিকে গরীব বলেছেন; আলবানী 'হাসান' বলেছেন।*

(১) ارادہ অর্থাৎ কোন কাজের ইচ্ছা। (২) قدرة (ক্ষমতা)। যদি এ দু'টি না থাকে তাহ'লে কোন 'কর্ম' পাওয়া যায় না। আর ইচ্ছা ও ক্ষমতা দু'টিই আল্লাহ্র সৃষ্টি। কারণ ইচ্ছা হ'ল মেধাগত শক্তির অন্তর্ভুক্ত। আর ক্ষমতা শারীরিক শক্তির অন্ত র্ভুক্ত। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে মানুষের মেধাকে ছিনিয়ে নিতেন। ফলে সে ইচ্ছাহীন হয়ে যেত। অথবা তার ক্ষমতাকে কেড়ে নিতেন। ফলে কাজ করা তার কাছে করার অসম্ভব হয়ে যেত।

যখন কোন মানুষ কোন কাজ করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। তখন আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, আল্লাহ তা চেয়েছেন ও তা করার শক্তি দিয়েছেন। নতুবা সেই কাজ থেকে তার ইচ্ছাকে পরিবর্তন করে দিতেন। অথবা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন। যা উক্ত কাজের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার ও তার ক্ষমতার মধ্যে প্রতিবন্ধক হ'ত। এক বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কিভাবে আল্লাহকে চিনলেন? তিনি বললেন, দৃঢ় ইচ্ছাকে ভেঙ্গে দেওয়া ও ঝোঁককে ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : মানুষকে তার পাপকর্মের জন্য শাস্তি দেয়া হবে। তাকে কিভাবে শাস্তি দেয়া হবে অথচ সেটা তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ আছে এবং তার পক্ষে তো তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ বিষয় হ'তে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়?

এর জবাবে আমরা বলব : যখন তুমি এটি বলবে তখন এটাও বল যে, মানুষকে আনুগত্যপূর্ণ কর্মের উপর পরস্কার দেওয়া হবে। তাহ'লে কিভাবে তাকে ছওয়াব দেয়া হবে, অথচ তার তা ভাগ্য লিপিবদ্ধ আছে? আর তার পক্ষে তো তার ভাগ্যে লিখিত বিষয় থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব? এটা ন্যায়-সঙ্গত নয় যে, তুমি পাপকাজের স্বপক্ষে ভাগ্যকে দলীল হিসাবে গ্রহন করবে। কিন্তু আনুগত্যের পক্ষে তাকে দলীল হিসাবে গ্রহন করবে না।

দ্বিতীয় জবাব : আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে এই দলীলকে বাতিল করেছেন। আর একে জ্ঞানবিহীন উক্তির মধ্যে অন্ত র্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ

'অচিরেই মুশরিকরা বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও করত না। আর হারাম কিছুই করতাম না। এভাবেই তাদের পূর্বে যুগের কাফিররা (রাসূলদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করা পর্যন্ত। তুমি জিজ্ঞেস কর। তোমাদের কাছে কি কোন ইলম আছে? যদি থাকে তবে তা আমাদেরকে পেশ কর। তোমরা ধারণা ও অনুমানই অনুসরণ করো। আর তোমরা আনুমানিক কথা বল' (*আন'আম ৬/১৪৮*)।

আল্লাহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন যে, তাক্বদীর দ্বারা শিরকের উপর দলীল পেশকারী এই সকল লোকের পূর্ব পুরুষগণও তাদের মত মিথ্যাচার করত। এবং এর উপর বিদ্যমান ছিল আল্লাহর শাস্তি আস্বাদন পর্যন্ত। যদি তাদের দলীল সঠিক হ'ত, তবে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি আস্বাদন করাতেন না। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নবী (ছাঃ)-কে চ্যালেঞ্জ করতে আদেশ করেছেন। তাদের দলীলের বিশুদ্ধার বিষয়ে প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমে আর বর্ণনা করেছেন যে, এ বিষয়ে তাদের কোন প্রমাণ নেই।

তৃতীয় জবাবে আমরা বলব : নিশ্চয়ই তাক্বদীর (ভাগ্য) গোপন ও লুক্কায়িত বিষয়। সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা জানে না। তাহ'লে পাপী বান্দা কোথা থেকে জানল যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পাপকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যে সে তার দিকে অগ্রসর হয়? এটা কি সম্ভব নয় যে, তার জন্য আনুগত্যকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? তাহলে কেন পাপের প্রতি অগ্রসর হওয়ার বদলে আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হয় না এবং বলে না, 'আল্লাহ আমার জন্য আনুগত্যকে লিপিবদ্ধ করেছেন'।

চতুর্থ জবাব : আমরা বলব, আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা দান করার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তার উপর গ্রন্থসমূহ নাযিল করেছেন এবং তার প্রতি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। তার কাছে ক্ষতিকর বস্তু থেকে উপকারী বিষয়গুলি বর্ণনা করেছেন এবং তাকে 'ইচ্ছা' ও 'শক্তি' দান করেছেন । যে দু'টির মাধ্যমে সে দু'টো পথের যে কোন একটির উপর চলতে পারে। তাহ'লে এই পাপ কেন ক্ষতিকর পথকে কল্যাণময় পথের উপর অগ্রাধিকার দেয়?

এই পাপী ব্যক্তিটি যদি কোন দেশে ভ্রমণ করার মনস্থ করে এবং তার জন্য দু'টি পথ থাকে। তন্মধ্যে একটি সহজ ও নিরাপদ। আর অন্যটি কষ্টকর ও শঙ্কাপূর্ণ। তাহলে অবশ্যই সে সহজ ও নিরাপদ পথে চলবে। সে কখনো কঠিন ও শঙ্কাপূর্ণ পথে চলবে না এই যুক্তি দিয়ে যে, আল্লাহ তার উপর এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। বরং সে যদি (এই কঠিন পথে) চলত ও দলীল দিত যে আল্লাহ তা'আলা এটি তার ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে অবশ্যই মানুষ সেটাকে বোকামী ও পাগলামী গণ্য করত। অনুরূপভাবে কল্যাণ ও অনিষ্টের পথের বিষয়টিও বরাবর। তাই মানুষ যেন কল্যাণের পথে চলে এবং অমঙ্গলের পথে চলার মাধ্যমে যেন নিজেকে ধোঁকা না দেয় এই যে, যুক্তি দিয়ে আল্লাহ তার উপর এটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমরা প্রত্যেক মানুষকে দেখি যে, সে উপার্জনে সক্ষম। আমরা জীবিকা অর্জনের তাকে জন্য প্রতিটি পথে চলতে দেখি। তাক্বদীরকে দলীলস্বরূপ পেশ করে আয়-উপার্জন পরিত্যাগ করে সে ঘরে বসে থাকে না।

তাহ'লে দুনিয়ার জন্য প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রচেষ্টার মাঝে তফাৎ কি? কেন তুমি আনুগত্য বর্জন করার ব্যাপারে তাক্বদীরকে তোমার পক্ষে দলীলরূপে পেশ করছ এবং দুনিয়ার কর্মকাণ্ডকে ত্যাগ করার ক্ষেত্রে তাক্বদীরকে

প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করছ না? নিশ্চয়ই বিষয়টি কোন স্থানে স্পষ্ট হয় (অর্থাৎ কখনো কখনো বিষয়টি অনুধাবনে আসে)। কিন্তু প্রবৃত্তি অন্ধ ও বধির করে দেয়।

যুবকদের বর্ণনা সম্বলিত কতিপয় হাদীছ : যখন এই কথাগুলি যুবকদের সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে... তখন আমি কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করতে চাচ্ছি। যেখানে যুবকদের উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় হ'ল-

(১) يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ 'তোমার প্রতিপালক এমন যুবককে ভালবাসেন যার 'ছবওয়া' নেই।[৭]

'ছবওয়া' হ'ল, প্রবৃত্তি পূজা এবং হক পথ থেকে বিরত হওয়া।

سَبْعَة يظلهم الله تَعَالَى فِي ظِلِّه يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرجل قلبه مُعَلَّق بِالْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرجل دَعَتْهُ امْرَأَة ذَات منصب وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ-

(২) ' যে দিন আল্লাহ্র (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সে দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। (ক) ন্যায়-পরায়ণ শাসক। (খ) যে যুবক আল্লাহ্র ইবাদতের ভিতর গড়ে উঠেছে। (গ) যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে থাকে (ঘ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের উপর। (ঙ) এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহবান জানিয়েছে। তখন সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (চ) যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে দান করে যে, তার ডানহাত যা দান করে, তার বামহাত জানতে পারে না। (ছ) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহ্র ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়ে পড়ে'।[৮]

(৩) الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ 'হাসান ও হুসায়েন জান্নাতবাসী যুবকদের সর্দার'।[৯]

(৪) জান্নাতীদেরকে বলা হবে- إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا 'তোমরা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না'।[১০]

(৫) مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ 'যে যুবক কোন বৃদ্ধকে সম্মান করবে তার বয়সের কারণে, আল্লাহ তাকে নির্ধারণ করবেন যে সেই যুবককে তার বয়সের কারণে তাকে সম্মান করবে'।[১১] *(তিরমিযী, দূর্বল সনদে)*।

(৬) আবূবকর (রাঃ) তার কাছে উমর ইবনুল খাত্ত্বাবের থাকার সময় যায়েদ বিন ছাবিতকে বললেন, إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَ لَا نَتَّهِمُكَ، كُنْتَ تَكْتُبُ الوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَّعِ القُرْآنَ فَاجْمَعْهُ 'তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। আমরা তোমাকে কোনরূপ দোষারোপ করি না। আর তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অহী লেখতে। কুরআনের সংকলন করে তা একত্রিত কর'।[১২]

دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: أَرْجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ-

(৭) 'মহানবী (ছাঃ) একজন যুবকের কাছে এলেন। সে তখন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন অনুভব করছ? যুবকটি বলল, আমি আল্লাহর কাছে (রহমত) প্রত্যাশা করছি হে আল্লাহর রাসূল ! আর আমি আমার পাপের জন্য আশঙ্কা করছি। নবী (ছাঃ) বললেন, এই যুবকটির মত কোন বান্দার হৃদয়ে দু'টি বিপরীত বস্তু এক হয় তাহ'লে আল্লাহ তাকে তার চাওয়া পূর্ণ করে দিবেন। আর সে যা হ'তে ভয় পায় তা থেকে নিরাপত্তা দান করবেন'।[১৩]

قَالَ: لاَ وَاللَّهِ، مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ، وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلاَحٍ

(৮) 'হুনায়নের যুদ্ধের সময় বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর কসম, না। রাসূল (ছাঃ) পালিয়ে যান নি। কিন্তু তার কিছু সংখ্যাক যুবক ছাহাবী (যুদ্ধের ময়দানে) বেরিয়ে গিয়েছিল কোন অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীতই'।[১৪]

(৯) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ 'আমরা যুবক বয়সে নবী (ছাঃ) এর সাথে যুদ্ধ করতাম'।[১৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سَبْعِينَ رَجُلًا يُسَمَّوْنَ الْقُرَّاءَ قَالَ: كَانُوا يَكُونُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا أَمْسَوْا انْتَحَوْا نَاحِيَةً مِنَ الْمَدِينَةِ، فَيَتَدَارَسُونَ وَيُصَلُّونَ

---

৭. *আহমাদ হা/১৭৩৭১; মু'জাম ইবনুল আরাবী হা/৮৬৬; আলবানী এর সনদকে 'জাইয়েদ' বলেছেন দ্র. হা/ সিলসিলাহ ছহীহা হা/২৮৪৩।*

৮. *বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।*

৯. *তিরমিযী হ/৩৭৬৮; তিনি হাদীছটিকে হাসান ছহীহ বলেছেন।*

১০. *মুসলিম হা/২৮৩৭।*

১১. *তিরমিযী হা/২০২২; আলবানী 'মুনকার' বলেছেন, যঈফা হা/৩০৪।*

১২. *বুখারী হা/৪৬৭৯।*

১৩. *ইবনে মাজাহ হা/৪২৬১; আলবানী ও যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) একে হাসান বলেছেন, তাহক্বীক্ব ইবনে মাজাহ হা/৪২৬১।*

১৪. *বুখারী হা/২৯৩০; মুসলিম হা/১৭৭৬।*

১৫. *আহমাদ হা/৩৭০৬।*

يَحْسِبُ أَهْلُوهُمْ أَنَّهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْسِبُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ أَنَّهُمْ عِنْدَ أَهْلِيهِمْ، حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي وَجْهِ الصُّبْحِ اسْتَعْذَبُوا مِنَ الْمَاءِ، وَاحْتَطَبُوا مِنَ الْحَطَبِ، فَجَاءُوا بِهِ فَأَسْنَدُوهُ إِلَى حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

(১০) 'আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আনছার গোত্রে সত্তরজন যুবক ছিল। তাদেরকে 'ক্বারী' বলা হ'ত। তারা মসজিদে থাকত। যখন সন্ধ্যা হ'ত তখন তারা মদীনার একপ্রান্তে গমন করত। তারা আলোচনা-পর্যালোচনা করত ও ছালাত আদায় করত। তাদের পরিবারবর্গ ভাবত তারা মসজিদে আছে। আর মসজিদে অবস্থানকারীগণ মনে করত তারা তাদের পরিবারের সাথে আছে। যখন ফজরের সময় হ'ত, তখন তারা সুস্বাদু পানি পান করত। তাঁরা কাঠ সংগ্রহ করত এবং তারা সেগুলি নিয়ে এসে নবী (ছাঃ) -এর ঘরে হেলান দিয়ে রেখে দিত'।[১৬] আর তারা এগুলি বিক্রয় করে আহলে ছুফ্ফার জন্য খাদ্য ক্রয় করত। আহলে ছুফ্ফা হ'ল মদীনায় হিজরতকারী নিঃস্ব-ফকীরগণ। যেখানে তাদের কোন পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন ছিল না। ফলে তারা মসজিদে একটি চালের নিচে কিংবা তার মসজিদের নিকটে থাকত।

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

(১১) 'ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর শিষ্য আলক্বামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহর সাথে মিনাতে হাঁটছিলাম। অতঃপর ওছমান (রাঃ) এর তার সাক্ষ্যাৎ হ'ল। তিরি তার সাথে দাঁড়ালেন। তাকে ওছমান বললেন, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমরা তোমার সাথে একটি যুবতীকে কি বিবাহ দিব না? যাতে করে সে তোমার অতীতে ঘটে যাওয়া কিছু বিষয় স্বরণ করিয়ে দেয়। তখন আব্দুল্লাহ বললেন, আপনি আমাকে এ কথা বলছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বলেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হ'তে যে সামর্থ রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিকে অবনত রাখে। লজ্জাস্থানের সর্বাধিক হেফাযতকারী। আর যে সক্ষম নয় সে যেন ছওম (নফল) পালন করে। কেননা তা তার জন্য (চরিত্র হেফাযতকারী) ঢালস্বরূপ'।[১৭]

(১২) দাজ্জালে সর্ম্পকে একটি হাদীছে নবী (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ ،رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، يَضْحَكُ

'দাজ্জাল একজন সুঠামদেহী যুবককে ডাকবে। তারপর তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করবে। আর তাকে ভীষণভাবে আঘাত করে দু'টুকরা করে ফেলবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে আহবান করবে এবং যুবকটি (জীবিত হয়ে) তার ডাকে সাড়া দিবে এবং প্রফুল্ল চিত্তে হাসতে থাকবে'।[১৮]

أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا – أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا – سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ – وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا – وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ–

(১৩) 'মালিক বিন হুয়ায়রিছ (রাঃ) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম। তখন আমরা সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা তার কাছে বিশদিন এবং বিশ রাত অবস্থান করলাম। আর মহানবী (ছাঃ) অত্যন্ত সদয় এবং নম্র ছিলেন। যখন তিনি ধারণা করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের প্রতি যেতে আকাংখা করছি কিংবা ব্যথা অনুভব করছি; তখন তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা আমাদের পিছে কাদেরকে ফেলে এসেছি। আমরা তা তাকে জানালাম। তিনি বললেন, তোমরা ফিরে যাও তোমাদের পরিবারের প্রতি। আর তাদের মাঝে অবস্থান কর। এবং তাদের শিক্ষা দাও ও তাদের আদেশ দাও। (বর্ণনাকারী বলেন) তিনি আরো কিছু উল্লেখ করেছিলেন যা আমার হিফয করেছি বা করিনি। আর (নবী (ছাঃ) তাদেরকে বলেছেন) তোমরা (সেই ভাবে) ছালাত পড়, যেভাবে আমাকে ছালাত পড়তে দেখছ। যখন ছালাত (ছালাতের সময়) উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্যে হ'তে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে'।[১৯]

আমরা যা আলোচনা করতে মনস্থ করেছিলাম তা এ পর্যন্তই। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা মঙ্গল করেন। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য। দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর পরিবারবর্গ এবং তার সকল ছাহাবীর উপর বর্ষিত হৌক- আমীন!

---

১৬. *আহমাদ হা/১৩৪৬২।*
১৭. *বুখারী হা/৫০৬৫; মুসলিম হা/১৪০০।*
১৮. *মুসলিম হা/২৯৩৭।*
১৯. *বুখারী হা/৬৩১।*

জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবার কতিপয় কারণ

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছেন *(দাহর ৭৬/৩)*। একটি জান্নাতের পথ, অপরটি জাহান্নামের। মানুষ আল্লাহ্র বিধান মেনে দুনিয়াতে চললে সে জান্নাতে যেতে পারবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র বিধান মুতাবিক না চললে তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে। আর আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্যই যে, কে অধিক সৎ আমলকারী *(মুলক ৬৭/২)*। তাই আমলে ছালেহের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের চেষ্টা করা মুমিনের সতত সাধনা। কিন্তু ছালাত, ছিয়াম, দান-ছাদাক্বা প্রভৃতি সৎ আমল করার পরেও মানুষ এমন কিছু কাজ করে থাকে, যা তাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। এই আমলগুলি সম্পর্কে জেনে তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

জান্নাত থেকে মাহরূম হওয়ার কারণগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) স্থায়ীভাবে মাহরূম হওয়া বা চিরস্থায়ী জাহান্নামী (খ) অস্থায়ীভাবে মাহরূম হওয়া অর্থাৎ প্রথমে কৃত পাপের কারণে জাহান্নামী হওয়া এবং পরবর্তীতে ঈমান ও অন্যান্য সৎ আমলের কারণে জান্নাতে যাওয়া।

(ক) স্থায়ীভাবে মাহরূম হওয়া :

১. শিরক করা : আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করলে জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ– 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদা ৫/৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে মারা গেল সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[১]

২. কুফরী করা : আল্লাহ্র সাথে কুফরী করার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَّخِذُوْا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيْنًا، وَالَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا– 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) পার্থক্য করতে চায় এবং বলে যে, আমরা কতক নবীকে বিশ্বাস করি ও কতক নবীকে অবিশ্বাস করি, আর এভাবে তারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। ওরাই হ'ল প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ৪/১৫০-৫১)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا، إِلاَّ طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا 'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করেছে, তারা দূরতম ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং (শেষনবীর আগমনবার্তা গোপন করে) যুলুম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। জাহান্নামের পথ ব্যতীত। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ' *(নিসা ৪/১৬৭-৬৯)*।

৩. মুনাফিকী : বাহ্যিকভাবে ঈমানের প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফর পোষণ করার নাম নিফাক বা মুনাফিকী। যার মধ্যে নিফাক পাওয়া যায় তাকে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিকের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আল্লাহ বলেন, بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا– 'ঐসব মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত আছে' *(নিসা ৪/১৩৮)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا– 'আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন' *(নিসা ৪/১৪০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا– 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে। আর তুমি কখনো তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ৪/১৪৫)*।

৪. মুরতাদ হওয়া : কেউ ইসলাম থেকে কুফরীতে ফিরে গেলে তাকে মুরতাদ বলে। এর পরিণাম জাহান্নাম। আল্লাহ

১. *মুসলিম হা/৯৩; মিশকাত হা/৩৮।*

বলেন, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ‘আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করবে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কর্ম নিষ্ফল হবে। তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং সেখানেই চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/২১৭)*।

খ. অস্থায়ী বা সাময়িকভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া :

ঈমান থাকা সত্ত্বেও মানুষের কিছু কর্মকাণ্ডের জন্য জাহান্নামে যেতে হবে। কিন্তু ঈমানের কারণে সে এক সময় জান্নাত লাভ করবে। ঐসব আমলগুলির মধ্যে কতিপয় উল্লেখ করা হ’ল।-

১. আত্মহত্যা করা :

আত্মহত্যা করা কবীরা গোনাহ। যার পরিণতি জাহান্নাম। আত্মহত্যাকারীকে জাহান্নামে ঐ শাস্তি দেওয়া হবে, যেভাবে সে ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। জুনদুব ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ بَدَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. ‘(তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে) এক ব্যক্তি আঘাতের ব্যথ্যা দুঃসহ বোধ করায় আত্মহত্যা করে। আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, আমার বান্দা আমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করলাম’।[২]

তিনি আরো বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ– ‘যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে। জাহান্নামে তাকে তা দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে’।[৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِيْ يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ– ‘যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ এভাবে আত্মহত্যা করবে। আর যে ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ এভাবে আত্মহত্যা করবে’।[৪] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا–

‘যে ব্যক্তি পাহাড় হ’তে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে লাফিয়ে পড়ে সর্বক্ষণ আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং সেটাই হবে তার চিরন্তন বাসস্থান। যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে, জাহান্নামে সে সর্বক্ষণ বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান। যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তার হাতে সেই লৌহাস্ত্রই থাকবে এবং জাহান্নামে সর্বক্ষণ নিজের পেটে সেটি ঢুকাতে থাকবে, জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান’।[৫]

উল্লেখ্য, হাদীছে উদ্ধৃত চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে কাফের-মুশরিকের মত চিরস্থায়ী বুঝানো হয়নি। বরং এটা দ্বারা তুলনা বুঝানো হয়েছে। কারণ কোন মানুষ আল্লাহর সাথে শিরক না করে মৃত্যুবরণ করলে তার বিষয়টি আল্লাহর আয়ত্তে হয়ে যায়। আল্লাহ তাকে শাস্তি দিলেও সেটা চিরস্থায়ী শাস্তি হবে না।[৬]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ فِى الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ‘যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা পৃথিবীতে আত্মহত্যা করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে তা দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে’।[৭]

২. মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা :

মানুষ হত্যা করা কবীরা গোনাহ বা মহাপাপ। আর মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা আরো বড় পাপ। আল্লাহ্র নিকটে দুনিয়া ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা মুমিন ব্যক্তি নিহত হওয়া কঠিনতর। মুমিনকে হত্যা করার পরিণতি জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوْا فِىْ دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللهُ فِى النَّارِ. ‘আসমান ও যমীনবাসী যদি কোন মুমিনকে হত্যায় শরীক হয় তাহ’লে আল্লাহ অবশ্যই তাদের সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন’।[৮]

৩. যিম্মীকে হত্যা করা :

ইসলামী রাষ্ট্রে যে সকল অমুসলিম নাগরিক জিযিয়া বা ট্যাক্স প্রদান করে বসবাস করে তাদেরকে যিম্মী বলা হয়। তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেশের সরকারের। বিনা কারণে তাদেরকে হত্যা করা পাপ। এ পাপের কারণে জান্নাত থেকে মাহরূম হ’তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا. ‘যে ব্যক্তি যিম্মীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধি ৪০ বছরের পথের দূরত্ব হ’তে পাওয়া যায়’।[৯]

---

২. বুখারী হা/১৩৬৫, ‘আত্মহত্যাকারী সম্পর্কে যা এসেছে’ অনুচ্ছেদ।
৩. বুখারী হা/১৩৬৩।
৪. বুখারী হা/১৩৬৫; মিশকাত হা/৩৪৫৪।
৫. বুখারী হা/৫৭৭৮; মুসলিম হা/১০৯; মিশকাত হা/৩৪৫৩।
৬. আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শরহু সুনানে আবী দাউদ ১৭/৪৪।
৭. বুখারী হা/৬০৪৭; মিশকাত হা/৩৪১০।
৮. তিরমিযী হা/১৩৯৮; মিশকাত হা/৩৪৬৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৫২৪৭।
৯. বুখারী হা/৩১৬৬, হা/৬৯১৪ ‘দিয়াত’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৪৫২।

৪. হারাম খাদ্য খাওয়া :

ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত হ'ল হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা। হারাম খাদ্য খেয়ে ইবাদত করলে তা যেমন কবুল হয় না, তেমনি হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ. 'হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১০]

অন্যত্র তিনি বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وكلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ. 'যে দেহের গোশত হারাম দ্বারা গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। শরীরের যতটুকু গোশত হারাম দ্বারা গঠিত তা জাহান্নামের জন্যই সর্বাধিক উপযুক্ত'।[১১]

৫. সূদ খাওয়া :

ইসলামে সূদ লেন-দেন করা হারাম। এতে ভোক্তা হয় শোষণ ও যুলুমের শিকার। আর দাতা হয় আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। অর্থনৈতিক শোষণের এ হাতিয়ার বন্ধের জন্য ইসলাম সূদকে হারাম করেছে। তদুপরি যারা সূদ লেন-দেন করে তাদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِىْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِى النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا-

'আর ঐ ব্যক্তি, যার কাছে পৌঁছে দেখেছিলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হ'ল সূদখোর'।[১২]

৬. মাদক ও নেশাদ্রব্য সেবন করা :

মাদকতা সকল পাপের মূল।[১৩] এর কারণে মানুষের ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না।[১৪] আর এর জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ اللهُ فِيْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ، قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা রয়েছে- নেশাদার দ্রব্য পানকারীদের আল্লাহ 'ত্বীনাতে খাবাল' পান করাবেন। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'ত্বীনাতে খাবাল' কি জিনিস? রাসূল (ছাঃ) বললেন, জাহান্নামীদের শরীর হ'তে নির্গত রক্তপুজ মিশ্রিত অত্যন্ত গরম তরল পদার্থ'।[১৫]

তিনি আরো বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ. 'সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১৬]

৭. অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করা :

সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহ। মানুষ পার্থিব জীবনে এগুলো ভোগ করার সুযোগ লাভ করে মাত্র। আবার এ সম্পদ মানুষকে দুনিয়াতেই রেখে যেতে হবে, কবরে নিয়ে যেতে পারবে না। অথচ মানুষ ইহকালের এ সাময়িক সময়ের জন্য অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন করে; যা বড় গোনাহ। এই গোনাহের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'নিশ্চয়ই কিছু লোক আল্লাহ্র সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম'।[১৭]

৮. আত্মসাৎ করা :

আত্মসাৎ করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ، فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর গনীমতের মালের দায়িত্বশীল ছিল, যাকে কারকারা বলা হত। সে মারা গেলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'সে জাহান্নামী'। ছাহাবীগণ তার নিকট গিয়ে তার প্রতি লক্ষ্য করলেন, তারা একটি চাদর পেলেন, যা সে আত্মসাৎ করেছিল।[১৮] অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِّنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا فُلاَنٌ شَهِيْدٌ فُلاَنٌ شَهِيْدٌ حَتَّى مَرُّوْا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوْا فُلاَنٌ شَهِيْدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ إِنِّيْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর (রাঃ) আমাকে বললেন, 'খায়বারের যুদ্ধের দিন ছাহাবীগণের একটি দল বাড়ী ফিরে আসছিলেন। ঐ সময় ছাহাবীগণ বললেন, অমুক অমুক শহীদ, শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তিকে ছাহাবীগণ শহীদ বললেন, যার ব্যাপারে রাসূল বললেন, কখনো নয়, আমি তাকে জাহান্নামে দেখছি, একটি চাদরের

১০. *বায়হাক্বী, মিশকাত/২৭৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯।*
১১. *আহমাদ, দারেমী, মিশকাত হা/২৭৭২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯।*
১২. *বুখারী হা/৭০৪৭।*
১৩. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭১; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৩৪; মিশকাত হা/৫৮০।*
১৪. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৭৩৮, হাদীছ ছহীহ।*
১৫. *মুসলিম হা/২০০২; মিশকাত হা/৩৬৩৯।*
১৬. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৬, হাদীছ ছহীহ।*
১৭. *বুখারী হা/৩১১৮; মিশকাত হা/৩৭৪৬।*
১৮. *বুখারী, ইবনু মাজাহ, হা/২৮৪১, মিশকাত হা/৩৯৯৮।*

কারণে যা সে আত্মসাৎ করেছিল'।[১৯] আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَصَابَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِيْ أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মিদ'আম নামে একটি গোলাম রাসূল (ছাঃ)-কে হাদিয়া দিয়েছিল। মিদ'আম এক সময় রাসূল (ছাঃ)-এর উটের পিঠের হাওদা নামাচ্ছিল এমতাবস্থায় একটি অতর্কিত তীর এসে তার গায়ে লাগে এবং সে মারা যায়। ছাহাবীগণ বলেন, তার জন্য জান্নাত। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কখনও নয়। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই যে চাদরটি সে খায়বারের গনীমত বণ্টন করার পূর্বে আত্মসাৎ করেছিল, সে চাদরটি জাহান্নামের আগুন তার উপর উত্তেজিত করছে। এ কথা শুনে একজন লোক একটি জুতার ফিতা বা দু'টি জুতার ফিতা রাসূলের নিকট নিয়ে আসল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, একটি বা দু'টি জুতার ফিতা আত্মসাৎ করলেও জাহান্নামে যাবে'।[২০]

৯. খিয়ানত করা :

খিয়ানত মুনাফিকের অন্যতম একটি আলামত। খিয়ানতের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে খিয়ানাত কর না এবং নিজেদের আমানতের খিয়ানত কর না' *(আনফাল ৮/২৭)*। অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ- 'নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি খিয়ানত করবেন। আর যে লোক খিয়ানত করবে সে ক্বিয়ামতের দিন সেই খিয়ানতকৃত বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই পরিপূর্ণভাবে পাবে যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না' *(আলে ইমরান ৩/১৬১)*।

হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে প্রায় খুৎবাতে বলতেন, لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ 'যার আমানাত নেই তার ঈমান নেই। যার অঙ্গীকার নেই তার দিন নেই'।[২১]

অন্যত্র তিনি বলেন,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

'যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তাকে সময় মত আমানত বুঝিয়ে দাও। আর যে তোমার খিয়ানত করে তার খিয়ানত করো না'।[২২]

১০. ঋণ পরিশোধ না করা :

ঋণ রেখে মারা গেলে এবং তা মৃতের পক্ষ থেকে কেউ পরিশোধ না করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ، فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هَذَا التَّشْدِيْدُ الَّذِى نُزِّلَ فَقَالَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ-

'সুবহানাল্লাহ! ঋণ প্রসঙ্গে কী কঠোর বাণীইনা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন! যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কেউ যদি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়, তারপর জীবিত হয়, তারপর শহীদ হয়, তারপর জীবিত হয়, তারপর আবার শহীদ হয় তবুও ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[২৩]

১১. মুসলমানের হক বিনষ্ট করা :

কোন মুসলমানের হক নষ্ট করা বড় গোনাহ। এটা বান্দার হক। বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ এ গোনাহ ক্ষমা করবেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِّنْ أَرَاكٍ-

'যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্য মুসলমানকে তার হক থেকে বঞ্চিত করে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন এবং জান্নাত হারাম করেছেন। একজন ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অল্প বস্তুর জন্য হ'লেও? অর্থাৎ খুব কম হ'লেও? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আরাক গাছের একখানা ডাল হ'লেও (এ শাস্তি দেয়া হবে)'।[২৪]

---

১৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৩৪।
২০. বুখারী হা/৬২১৩, আবু দাউদ হা/২৭১৩; মিশকাত হা/৩৯৯৭।
২১. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩৫ 'ঈমান' অধ্যায়, সনদ হাসান।
২২. তিরমিযী, আবূদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/২৯৩৪।
২৩. নাসাঈ হা/৪৬৮৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৬০০।
২৪. মুসলিম হা/১৩৭; মিশকাত হা/৩৭৬০।

১২. ব্যভিচার করা :

যেনা-ব্যভিচার পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা, অপমান ও অসম্মানের কারণ, তেমনি পরকালীন জীবনে একাজ জাহান্নামী হওয়ার কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

'তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের তিনি পবিত্রও করবেন না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে- (১) বৃদ্ধ যেনাকার (২) মিথ্যাবাদী শাসক এবং (৩) অহঙ্কারী দরিদ্র ব্যক্তি'।[২৫]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপর অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন প্রজ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হতে বাইরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হত। আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা শিথিল হত, তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ'।... আর (আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হল যেনাকারী (নারী-পুরুষ)।[২৬]

১৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যারোপ করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যারোপ করা জঘন্য পাপ। এর পরিণতি জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. 'আমার একটি কথাও জানা থাকলে অন্যের নিকট পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনীও প্রয়োজনে বর্ণনা কর, এতে কোন দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়'।[২৭] তিনি আরো বলেন, مَنْ يَّقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. 'যে ব্যক্তি আমার উপরে এমন কথা আরোপ করল, যা আমি বলিনি, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।[২৮]

১৪. মিথ্যা বলা :

সততা ও সত্যবাদিতা মানব চরিত্রের এক অনুপম গুণ। যার পুরস্কার জান্নাত। পক্ষান্তরে মিথ্যাচার মানব চরিত্রের দুষ্টক্ষত, যা পাপের কারণ। এর পরিণতি জাহান্নাম। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِي النَّارِ. 'তোমরা সত্য গ্রহণ কর। সত্য নেকীর সাথে রয়েছে। আর উভয়টি জান্নাতে যাবে। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপের সাথে রয়েছে। উভয়ই জাহান্নামে যাবে'।[২৯] অন্যত্র তিনি বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا-

'তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল সত্য কথা বলা। কেননা সততা নেকীর পথ দেখায় এবং নেকী জান্নাতের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে তাকে আল্লাহ্র খাতায় সত্যনিষ্ঠ বলে লিখে নেয়া হয়। তোমরা মিথ্যা বলা থেকে সাবধান থাক। কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাকে আল্লাহ্র খাতায় মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়'।[৩০]

১৫. অহংকার করা :

কোন মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং সে অন্যের উপরে নির্ভরশীল। কখনো কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলে, তার জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে হবে। এর জন্য অহংকার করা সমীচীন নয়। কারণ এ শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিপত্তি চিরস্থায়ী নয়। যে কোন সময় তা দূরীভূত হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে অহংকার গোনাহের কারণ। যার ফলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে হয়। আল্লাহ বলেন,

فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا-

'অতএব যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে তিনি পূর্ণরূপে পুরস্কার দান করবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে আরও বেশী দান করবেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র ইবাদতে সংকোচ বোধ করে ও অহংকার করে, তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি প্রদান করবেন। আর তারা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে পাবে না' *(নিসা ৪/১৭৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

---

২৫. মুসলিম হা/১০৭; মিশকাত হা/৫১০৯।
২৬. বুখারী, হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১।
২৭. বুখারী হা/৩৪৬১; তিরমিযী হা/২৬৬৯; মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়।
২৮. বুখারী হা/১০৯।
২৯. ইবন মাজাহ হা/৩৮৪৯; ইবনু হিব্বান হা/৫৭৩৪; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪১৮৬; আদাবুল মুফরাদ হা/৭২৪, সনদ ছহীহ।
৩০. বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম ২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪।

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

'যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন এক ব্যক্তি বলল, কেউ তো পসন্দ করে যে, তার পোশাক ভাল হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (এটাও কি অহংকার)? তিনি বললেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পসন্দ করেন। অহংকার হ'ল, হককে দম্ভ ভরে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে হীন ও তুচ্ছ মনে করা'।[৩১]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِداً مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ جَهَنَّمَ. 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, অহংকার আমার চাদর আর আত্মম্ভরীতা আমার লুঙ্গী। এই দু'টির কোন একটি কেউ আমার থেকে খুলে নিতে চাইলে আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব'।[৩২] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ-

'যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩৩]

১৬. পিতা-মাতার অবাধ্যতা :

পিতামাতা মানুষের দুনিয়াতে আগমনের মাধ্যম। শৈশবে তাদেরই অকৃত্রিম লালন-পালন, আন্তরিক সেবা-যত্ন ও অপত্য স্নেহ-মায়া-মমতা মাখা আদরে বড় হয়ে ওঠে সন্তান। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সেই পিতামাতার অবাধ্য হওয়া তাদের প্রতি কৃতঘ্ন হওয়ার নামান্তর। এ অপরাধের কারণে পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوْثُ وَرَّجْلَةُ النِّسَاءِ. 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না- (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী ব্যক্তি (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী'।[৩৪] তিনি আরো বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ قَمَّارٌ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ. 'পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়া ও লটারীতে অংশগ্রহণকারী, খোঁটাদানকারী এবং সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩৫]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِيْ أَهْلِهِ الْخَبَثَ. 'তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করেছেন। (১) সর্বদা মদপানকারী, (২) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও (৩) পরিবারে বেপর্দার সুযোগ দানকারী (দায়ূছ)'।[৩৬]

১৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা :

মানুষের মাঝে বিভিন্ন কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্ক রক্ষা করা হায়াত ও রিযিক বৃদ্ধি এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা যরূরী। কেননা এ সম্পর্ক ছিন্ন করা জান্নাত থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩৭]

১৮. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া :

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া মুমিনের জন্য সমীচীন নয়। বরং প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা মুমিনের কর্তব্য। আর তার সাথে ভাল ব্যবহার করলে জান্নাতে যাওয়া যায়। পক্ষান্তরে তার সাথে অসদাচরণ করা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'।[৩৮] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ هِيَ فِي النَّارِ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا، قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা অধিক ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে এবং দান-ছাদাক্বাহ করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম ছিয়াম পালন করে, দান-ছাদাক্বাও কম করে এবং ছালাতও কম আদায় করে। তার দানের পরিমাণ হ'ল পনীরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী'।[৩৯] *(ক্রমশঃ)*

---

৩১. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮।
৩২. আবুদাউদ হা/৪০৯০; মিশকাত হা/৫১১০; ছহীহাহ হা/৫৪১, সনদ ছহীহ।
৩৩. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮।
৩৪. নাসাঈ হা/২৫৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৩-৭৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৭০।
৩৫. দারেমী, মিশকাত হা/৩৬৫৩, ৪৯৩৩ 'শাস্তি' অধ্যায়; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭০, ৬৭৩, সনদ হাসান।
৩৬. নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬৫৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩৬৬।
৩৭. বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬, মিশকাত হা/৪৯২২।
৩৮. মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬৩।
৩৯. আহমাদ হা/৯৬৭৩; মিশকাত হা/৪৯৯২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯০।

সফল খতীব হওয়ার উপায়

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

তৃতীয়ত : ইলমের ভাণ্ডার এবং সাংস্কৃতিক সম্ভার :

এই বিষয়বস্তু কয়েকটি জিনিসকে শামিল করে। যা নিম্নে পেশ করা হ'ল-

(ক) পবিত্র কুরআনুল কারীম মুখস্থ করা :

খতীব তার বক্তব্যে আয়াত সমূহ সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করবে। যদি আয়াত তেলাওয়াত করে তাহ'লে তার বিবরণ পেশ করবে। অথবা তার বেশী অংশ হ'তে অল্প পরিমাণ হ'লেও তেলাওয়াত করবে। নিঃসন্দেহে হাফেযে কুরআনের ক্বলবে অধিক পরিমাণ আয়াত সংরক্ষিত থাকে। নিশ্চয়ই এই গুণাবলী সফল খতীবের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজনীয় পরিমাণ তেলাওয়াত করা খতীবের জন্য যরূরী শুধু সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি নয় বরং প্রথমত খতীবকে আল্লাহ্র কিতাব ছহীহ ও শুদ্ধ ভাষাগত ভুল-ত্রুটি ছাড়াই সাবলীলভাবে তিলাওয়াত করতে সক্ষম হওয়া। এ মর্মে আল্লাহ্র বাণী, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত কর' *(মুযযাম্মিল ৭৩/৪)*।

অতঃপর বক্তব্যের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত আয়াত সমূহ উপস্থাপন করার এবং সেই আয়াতের তাফসীরে বিদ্বানগণের অভিমত জানা আর এর ব্যাখ্যার ছহীহ ও যঈফ কে পার্থক্য করার এবং এ সংশ্লিষ্ট ইসরাইলী কাহিনী ও মিথ্যা উদ্ভট কথা এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ইলম অর্জন করা।

আর খতীবের জন্য সতর্কতা হ'ল সে যেন আয়াত সমূহ যথাযথ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র চালিয়ে না দেয় (অপব্যাখ্যা যেন না করে) অথবা আয়াত সমূহকে যামানার উন্মোচিত কোন মতবাদের অধীনে না করে অথবা সময় ও স্থানগত কোন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতা না করে। এই উল্লিখিত বিবরণ সমূহ আল্লাহ্র দ্বীনের বিপরীত কাজ।

(খ) রাসূলের (ছাঃ)-এর হাদীছ অধিক পরিমাণে মুখস্থ করা :

আর বিশেষ করে নতুন খতীবদের জন্য رياض الصالحين কিতাব মুখস্থ করা উচিত। কেননা এ কিতাব সহজ, অল্প শব্দ এবং সুন্দর ইবারত বিন্যাস করণ এবং অধ্যায়ের সাথে বিষয়বস্তুর অধ্যায় মিল করা হয়েছে নিপুনতার সাথে।

(গ) কুরআনুল কারীমের কিচ্ছা-কাহিনীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য :

যেহেতু কুরআন মাজীদে অনেক শিক্ষণীয় কাহিনী রয়েছে যাতে মানুষের চিন্তার খোরাক আছে। আর মানুষ এ প্রকারের আলোচনা পসন্দ করে।

কুরআনের বিভিন্ন উল্লিখিত কিচ্ছা-কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ-

'আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কারো কারো কাহিনী আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি আর কারো কারো কাহিনী তোমার কাছে বর্ণনা করিনি' *(মু'মিন ৪০/৭৮)*।

(ঘ) রাসূল (ছাঃ)-এর যুদ্ধ সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ও যোদ্ধাদের জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের উপস্থাপন করা :

কেননা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ হ'ল ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জীবন ও সম্পদ সমূহ ক্রয় করে নিয়েছেন'। মহান আল্লাহ্র ঘোষণা-

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতঃপর তারা হত্যা করে অথবা নিহত হয়। এর বিনিময়ে তাদের জন্য (জান্নাত লাভের) সত্য ওয়াদা করা হয়েছে তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্র চাইতে নিজের অঙ্গীকার অধিক পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময়ে (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ কর যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটাই হ'ল মহান সফলতা' *(তওবা ৯/১১১)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর ওটা হল নিকৃষ্ট ঠিকানা' *(তওবা ৯/৭৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছে আল্লাহ্র রাস্তায় 'জিহাদের আলাদা ১০০ গুণ মর্যাদা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন,

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِىَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. قَالَ وَمَا هِىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ-

'আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে আবু সাঈদ! যে কেউ আল্লাহকে রব, এবং ইসলামকে জীবন বিধান মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে তার উপর জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। এ কথা শুনে আবু সাঈদ আশ্চর্যবোধ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কথাটি আমাকে পুনরায় বলুন। সুতরাং তিনি কথাটি আবার বললেন। এতদ্ভিন্ন আরো একটি কাজ আছে যা জান্নাতে বান্দার মর্যাদা একশ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়। এর যে কোন দু'টি স্তরের উচ্চতার মাঝখানে আসমান ও যমীনের সমান ব্যবধান। তখন আবু সাঈদ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেই কাজটি কি? তিনি বললেন আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ'।[১]

আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ-

'আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, সবচেয়ে উত্তম লোক কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে তার জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। এরপর আবার জিজ্ঞেস করল এরপর কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি গিরি-সংকটে বসবাস করে আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে মানুষকে নিরাপদে রাখে'।[২]

(ঙ) ছাহাবীগণের জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত :

তারা হ'লেন শ্রেষ্ঠতম মানব এবং মনোনীত জামা'আত। মানুষের নিকট তারা অনুকরণীয় নমুনা এবং মানুষের জীবনের সাথে মেলবন্ধন। রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের সম্পর্কে বলেন, خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِىءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ- আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের সংশ্লিষ্ট লোকে (ছাহাবীরা)। অতঃপর তাদের যুগের সাথে সংযুক্ত যুগের লোকে (তাবেঈরা)। অতঃপর তাদের যুগের সাথে সংযুক্ত যুগের লোক (তাবে-তাবেঈগণ)। অতঃপর এমন লোকের আর্বিভাব হবে যারা সাক্ষ্য দেয়ার পরপর শপথও করবে এবং শপথ করার সাথে সাথে সাক্ষ্যও দিবে'।[৩]

(চ) শরী'আতের ইমামত ও ছালাত সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান :

এই গুণাবলী প্রথম গুণাবলী (হিফযুল কুরআন) শাখা। কিন্তু আমরা ছালাত ও ইমামতকে আলাদা করেছি এর প্রতি গুরুত্ব ও মনোযোগ আকর্ষণের জন্য।

সুতরাং খতীবের উচিত হবে তাকে খুৎবা ও ছালাতের শর্তসমূহ, গ্রহণীয় ও অগ্রহণীয় হওয়ার নিয়ম-কানুন ও তার ধরনসমূহ এবং এর পূর্ণতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। আর এই শর্তারোপ করা হয়নি যে তাকে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানী, মুজতাহিদ হ'তে হবে তাকে সমস্ত হুকুম-আহকামের ব্যাপারে মুফতি ও সৃষ্টিজগতের মাঝে পণ্ডিত হওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি। কেননা অবশ্যই ঐ গুণাবলী সমূহ পূর্ণতার শিখরে আরোহনের জন্য সহায়ক। তবে তা খতীব হিসাবে গ্রহণীয় ও অগ্রহণীয় হওয়ার মাপকাঠি নয়।

(ছ) ইতিহাসের জ্ঞান :

ইতিহাস চর্চা খতীবকে সচেতন করে ও তার বিবেককে শানিত করে। তার মাঝে অতীত জাতির অবস্থা, মণীষীগণের জীবন চরিত এবং তাদের সেই সময়কাল ও (বর্তমান) সময় কালের অবস্থা সম্পর্কে সজাগ করে তোলে এবং ইতিহাসে সে অবলোকন করবে পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রদত্ত জাতিসমূহের এবং তাদের সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের উপর আপতিত শাস্তি, জয় ও পরাজয়ের আহ্বান। সুতরাং ইতিহাস থেকে ঈমান, তাকওয়ার সুফল এবং কুফরী ও পাপাচারের কুফল স্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয়। ইতিহাস হ'ল পেছনের ফেলা আসা যুগসমূহের দর্পণ।

আল্লাহ তা'আলা (কুরআনে) কিচ্ছা-কাহিনীর গুরুত্ব এবং পূর্ববর্তীদের অবস্থা দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্র বাণী, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ- 'বল, তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক' *(রূম ৩০/৪২)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ- 'আমরা তাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি। যারা পাকড়াও করার ক্ষেত্রে এদের তুলনায় ছিল প্রবলতর, তারা দেশ-বিদেশ চষে বেড়াত। তাদের কি কোন পলায়নস্থল ছিল'? *(ক্বাফ ৫০/৩৬)*।

তিনি আরো বলেন,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ-

'নিশ্চয়ই নবীদের কাহিনীতে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে' *(ইউসুফ ১২/১১১)*।

যখন দাঈ ও খতীব ইতিহাস অধিক চর্চা করবে এবং সেখান থেকে ফায়েদা হাছিল করবে, তখন তার জন্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। সে যে পথের দাওয়াত দেয় তাতে আরো সঠিকভাবে নিয়োজিত হ'তে সহায়ক হবে। বিশেষ করে যখন সে কোন স্থানের দৃষ্টান্ত পেশ করবে এবং কোন বিষয়ে সাদৃশ্য বোঝানোর জন্য সহায়তা নিবে। *(ক্রমশঃ)*

(আমীর ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাদরীর বই অবলম্বনে লিখিত)

[লেখক : ২য় বর্ষ আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

১. *মুসলিম হা/১৮৮৪; মিশকাত হা/৩৮৫১।*
২. *বুখারী হা/২৭৮৬; মুসলিম হা/১৮৮৮।*
৩. *বুখারী হা/২৬৫২; মুসলিম হা/২৫৩৩।*

Contents

কবিতা

স্বীকৃতির প্রতিদান

-আবু আব্দুল্লাহ রাযী, রাজশাহী

আল্লাহ এক, স্বীকৃতিতে মুমিন বল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
তাওহীদের ঐ ঝাণ্ডাবাহী নবী মুহাম্মাদ ছাল্লিল্লাহ।
কালের গর্ভে বিলীন দ্বীনকে করতে উজ্জীবিত,
অহি-র বিধান প্রাপ্ত হ'ল আব্দুল্লাহ্র পুত্র।
জাহেলী যুগের বর্বরতা করতে নস্যাৎ,
দাওয়াত দিল আমেনার ধন মানল না জাতপাত।
যে 'আল-আমীন' ছিল সবার চোখের মণিতুল্য,
আল্লাহ এক আহ্বানে সবাই তারে দললো।
চোখের বালি হ'লেন নবী আরববাসীর কাছে,
গুটি কয়েক তরুণ এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে।
আহার নেই নিদ্রা নেই মলিন তাদের-মুখ,
কালেমার কেতন উড্ডীন করবে ওটাই তাদের সুখ।
শাহাদাত ছিল কাম্য তাদের, তাই তারা সদা অকুতোভয়,
হাবশী বেলাল সফল হ'ল ঈমান আরও দীপ্তি পেল,
ইসলাম এবার বিজয়ী হ'ল সমগ্র ধরায়।

--o--

জীবনের মানে

-আব্দুর রউফ সালাফী

ছোট্ট বেলা খেলায় কেটেছে জননীর কোলে,
শৈশব কাটালাম দৌড়-ঝাঁপ আর হাঁসি-উল্লাসে,
যৌবনের বেগে ছুটেছি কালস্রোতে অবলীলায় ভেসে।
ভাবিনিতো হায়! এ জীবন হবে ক্ষয় এক নিমিষে,
হে যুবক! তুমি অগ্নিগোলক ধর খঞ্জন কশে,
ডেকেছে নযরুল শুনিনি! থেকেছি উম্মাদ বেশে।
জীবনের পড়ন্ত বিকেলে সম্মতি ফিরে পেয়ে করি হাহাকার,
কেমনে করিব ইবাদত! রুগ্ন আমি অসাড় নির্বিকার।
কেবল ভগ্ন হৃদয়ে হায়! জীবন প্রদীপ নিবুনিবু করে,
অবশেষে ভাই! হুঁশ ফিরে পায় বুঝলাম জীবনের মানে।

--o--

আহলেহাদীছ কি?

-মুহাম্মাদ নাজমুল হক্ব, নারায়ণগঞ্জ

আহলেহাদীছ হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী।
আহলেহাদীছ হ'ল শিরক-বিদ'আত মুক্ত
তাওহীদের ঝাণ্ডা উত্তোলনকারী।
আহলেহাদীছ হ'ল সারা দুনিয়ার ত্বাগূতের বিরুদ্ধে
এক আপোষহীন অহি-র আন্দোলনের নাম।
আহলেহাদীছ হ'ল ইজমা, ক্বিয়াস, ফিকহ্ ছেড়ে
কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আঁকড়ে ধরার নাম।
আহলেহাদীছ হ'ল সবদিক ছেড়ে ফিরে অহি-র পথে থাকা।
আহলেহাদীছ হ'ল ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক
তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অহি-র পথে চলা।
আহলেহাদীছ হ'ল একটি দাওয়াতের নাম।
আহলেহাদীছ হ'ল পৃথিবীতে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করার
এক আপোষহীন কাফেলার নাম।
আহলেহাদীছ হ'ল দলীয় গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠে
নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানা।
আহলেহাদীছ হ'ল সার্বিক জীবনে তাক্বওয়া অবলম্বন করা।
আহলেহাদীছ হ'ল সৃষ্টিকে স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী
পরিচালিত করার দাওয়াতী কাফেলার নাম।
আহলেহাদীছ হ'ল চরমপন্থা পরিহার করে
সামাজিক ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
আহলেহাদীছ কোন মতবাদ নয়,
ইহা একটি সঠিক পথের নাম।
আহলেহাদীছ হ'ল মানুষের সার্বিক জীবনকে
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনা করার গভীর প্রেরণার নাম।
আহলেহাদীছ হ'ল জেল-যুলুম সহ্য করেও নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত।
সর্বমহলে পৌঁছে দেওয়ার কাফেলার নাম।
আহলেহাদীছ হ'ল শিরক ও বিদ'আত মূলোৎপাটনকারী
এক আন্দোলনের নাম।
আহলেহাদীছ হ'ল নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।
আহলেহাদীছ হ'ল আল্লাহ্র সর্বশেষ অহি ভিত্তিক
সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এক বৈপ্লবিক সংগ্রাম।
আহলেহাদীছ হ'ল কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র
সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখার
চিরন্তন শহীদী কাফেলার নাম।

--o--

এগিয়ে চল সম্মুখপানে

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব, কুষ্টিয়া

ইতিহাস যাদের গৌরবময়, চির দীপ্তিমান,
এমন শ্রেষ্ঠ জাতি নাম তার মুসলমান।
শুনিয়েছিল যারা দিকে দিকে সাম্যের জয়গান,
পদচুম্বন করেছিল যাদের নেতৃত্ব আর সম্মান।
খলীফা ওমর করেছেন শাসন অর্ধ-পৃথিবী,
কায়েম হয়েছিল সংঘাতমুক্ত শান্তিররাজ, নয় তো বিপ্লবী।
ধরণী কেন হয়েছে আজ রক্তে রঞ্জিত,
সবখানে আজি যায় দেখা মুসলিম লাঞ্ছিত।
এভাবেই কি বইবে তুমি লাঞ্ছনার ঐ বোঝা?
উড়িয়ে আবার দেখাও তুমি মহাসত্যের ধ্বজা।
অবনী পরে তোমার অবদান নয়তো সামান্য,
প্রয়োজন শুধু তোমার লাগি একটু চৈতন্য।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাদিক করেছ উন্মোচন,
শিল্প-সাহিত্যেও রেখেছ তুমি বহুমুখী অবদান।
মানব-সভ্যতার ইতিহাস তো তোমার হাতেই গাঁথা,
ধরা-মাঝে জানে না কে এসব সত্য কথা।
চিকিৎসা শাস্ত্রে তুমিইতো আলী ইবনু সীনা,
'কানুন ফিত তিব্ব' তোমার সৃষ্টি নয়তো কারো অজানা।
এতকিছু করেও তুমি নির্যাতনের শিকার,
পূর্বসূরীদের আদর্শে জেগে ওঠ ফের হয়ে দুর্নিবার।
তুমিই পারো রুখে দিতে সকল আগ্রাসন,
শাহাদত তোমায় করবে আলিঙ্গন।
তোমার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি রয়েছে সবখানে,
মুসলিম! তুমি এগিয়ে চল সম্মুখপানে।

গুয়ানতানামো বে'র কারারক্ষীর ইসলাম গ্রহণ

টেরি হোল্ড্রুক ১৯ বছরের আমেরিকান এক উচ্ছৃঙ্খল যুবক। হাতে ট্যাটু আঁকা, উন্মত্ত চলাফেরা, মদ, যৌনতা আর রক এন্ড রোল মিউজিকে ডুবে থাকত জীবন। তিনি ভাবতেন সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই, দুনিয়ার জীবনই সব। এগুলো ২০০৩ সালের কথা।

কিন্তু মহান আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন, দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই তাকে সত্য পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আল্লাহ বলেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথ প্রদর্শন করে থাকেন' *(বাক্বারা ২/১৪২)*।

এর প্রমাণ হিসেবেই যেন ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে নিজেকে মুসলিম ঘোষণা করে, টেরি হোল্ড্রুক থেকে হয়ে যান মুছত্বফা আবদুল্লাহ।

৭ জুলাই ১৯৮৩ সালে আমেরিকার আরিজোনায় জন্ম নেওয়া টেরি হোল্ড্রুকের বয়স যখন সাত, বাবা-মা তাকে ফেলে যে-যার-মতো পথ বেছে নিয়েছিলেন। টেরি বড় হ'লেন দাদার কাছে।

২১ বছর বয়সে টেরি ভাবলেন, কিছু একটা করা দরকার। ৯/১১-এর কিছু পরের ঘটনা, আমেরিকায় তখন মিলিটারিতে নতুন নিয়োগ দেয়া হচ্ছে অনেক সৈন্যকে। বিশেষ বোনাস পাওয়ার সুবিধা দেখে মিলিটারি পুলিশের চাকরি নিলেন টেরি।

টেরির দায়িত্ব পড়ল গুয়ানতানামোর বে'র কারারক্ষী হিসাবে। ইসলাম নিয়ে তখন টেরির কোনো ধারণাই ছিল না। তাকে বারবার ৯/১১-এর ভিডিও দেখানো হ'ত, বলা হ'ত, গুয়ানতানামো বে'তে যারা আছে, তারা এসব করেছে, তারা মানুষ নয়। তারা সামনে পেলেই তোমাকে খেয়ে ফেলবে। এদের সাথে কথা বলবে না, মেলামেশা করবে না। কারাগারে গার্ড দিতে গিয়ে একজনকে আবিষ্কার করলেন টেরি। তার বয়স ১৬। টেরি বুঝে উঠতে পারলেন যে, ছেলে এখনো সাগর দেখেনি, দুনিয়া কীভাবে চলে তা জানেনি, সে ওয়ার অন টেরর-এর কী বুঝে?

> 'আমি যতই ইসলামকে জানতে লাগলাম, ইসলাম যেন ততই আমার কাছে আসতে লাগল'।

টেরি আরো দেখলেন, কিছু সাধারণ মুসলিমদের, যাদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে ধরে আনা হয়েছে। তাদের কেউ ট্যাক্সি ড্রাইভার, ডাক্তার, প্রফেসর, সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ। টেরির দায়িত্ব ছিল কারাবন্দীদের ইন্টারোগেশন সেলে নিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে নিয়ে আসা। গুয়ানতানামো বে'র কারাগারে নিষ্ঠুর আর অমানুষিক নির্যাতনের সাক্ষী তিনি। তিনি বলেন, বন্দীকে শিকলে বেঁধে তাদের উপর হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দেয়া হ'ত, কুকুরগুলো তাদের মুখের ঠিক সামনে ঘেউ ঘেউ করত এবং কখনো কামড়ে দিত।

প্রচণ্ড চাপের মুখে রাখা হ'ত কারাবন্দীদের, তাদের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মাঝে লোহার খাঁচায় ফেলে রাখা হ'ত দিনের পর দিন। এমন কারাবন্দীও আছে গুয়ানতানামো বে'তে, যাদের রুমের বাতি গত ৬/৭ বছর ধরে বন্ধ করা হয়নি, ক্ষণিকের জন্য তারা অন্ধকারে শান্তিতে ঘুমাতে পারেননি। টর্চারের সময় তাদের মুখের সামনে ৬০ ডিগ্রী তাপমাত্রার আলো জ্বালিয়ে রাখা হ'ত, কানের কাছে গান বাজানো হ'ত ঘন্টার পর ঘন্টা।

টেরি বলেন, গুয়ানতানামো বে'তে বন্দীদের নির্যাতন করা হ'ত কোনো কারণ ছাড়াই। কথা নেই, বার্তা নেই, চার-পাঁচ জন এসে কোনো বন্দীকে ধরে বেধড়ক পেটাতে শুরু করত, কখনো দরজার মধ্যে হাত-পা চাপা দিত। তারা বন্দীদের মাথা ধরে কমোডে চুবিয়ে দিয়ে ফ্লাশ করে দিত। কখনো তার মরিচের গুঁড়া স্প্রে করে দিত বন্দীদের মুখে।

কারাবন্দীদের সাথে ফাঁকে ফাঁকে কথা বলতে চেষ্টা করতেন টেরি। তার সহকর্মীরা বিষয়টি পসন্দ করত না, তারা তাকে নিয়ে বিরক্ত হয়ে বলত, আমরা আজকেই তোমার মাথা থেকে তালিবানদের ভূত তাড়াবো, তবু টেরি হাল ছাড়লেন না। অবাক হয়ে দেখলেন এই মুসলিমগুলোর উপর শত অত্যাচার আর নির্যাতন সত্ত্বেও তাদের মাঝে যেন একটা প্রশান্তি আর সন্তুষ্টি আছে। বন্দী হয়েও তারা যেন মুক্ত, আর কারারক্ষী হয়েও টেরি যেন বন্দী। সবসময় বসের অর্ডার মানতে গিয়ে তার নিজেকে মনে হ'ত দাস। তার যেন থেকেও নেই, আর বন্দীদের কিছু নেই তবু তাদের মুখে হাসি। নাইট শিফটের সময়ে তিনি বন্দীদের সাথে খোলাখুলিভাবে সবকিছু নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলেন, ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, কালচার, নৈতিকতা সবকিছু। কারাবন্দীদের ইসলাম চর্চায় তিনি মুগ্ধ হ'লেন।

তিনি ইসলামের মধ্যে তা আবিষ্কার করলেন যার সন্ধান তিনি এতদিন করে আসছিলেন, শৃঙ্খলা এবং নিয়মতান্ত্রিকতা, যা একজন মানুষের হৃদয়কে তুষ্ট করতে পারে। অবাধ স্বাধীনতা কেবল মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে অনিয়ন্ত্রিত করে তোলে, কখনই তা হৃদয়কে শান্ত করতে পারে না। তিনি আল্লাহ্‌র দাসত্বের মাঝে শান্তি পেতে শুরু করলেন।

আহমেদ এরাচিদি নামের এক মরোক্কানের সাথে টেরির পরিচয় হয় কারাগারে। আহমেদ প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর

গুয়ানাতানামোয় বন্দী ছিলেন। আল-কায়েদার ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দেয়ার অভিযোগে তাকে আটকে রাখা হয়। আহমেদ তার কুরআনের কপিটি টেরিকে পড়তে দিলেন। টেরি কুরআন পড়তে শুরু করলেন, এবং এর মাঝে তিনি যুক্তিবোধের ছোঁয়া পেতে থাকলেন। খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদিধর্ম কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু তিনি ইসলামের প্রেমে পড়ে গেলেন। তার ভাষায়, 'আমি যতই ইসলামকে জানতে লাগলাম, ইসলাম যেন ততই আমার কাছে আসতে লাগল'।

টেরির অন্য সহকর্মীরা যেখানে পর্নোগ্রাফি, নেশা আর খেলাধূলায় ব্যস্ত, সেখানে টেরি ইসলাম নিয়ে পড়াশোনায় সময় ব্যয় করতে লাগলেন। আজকের গতানুগতিক মুসলিমদের যেখানে বছরে এক ঘন্টাও ইসলাম নিয়ে পড়াশোনার সময় হয় না, সেখানে টেরি প্রতিদিন ইসলামকে জানতে ও বুঝতে ব্যয় করতে থাকেন। একটা সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

এক কারাবন্দীদের কাছে গিয়ে জানালেন এ কথা। সে বলল, তুমি ভালো করে ভেবে দেখেছ তো? ইসলাম কোনো হাসিঠাট্টার বিষয় নয়, এটা সিরিয়াস ব্যাপার, জীবন বদলে যাবে তোমার। তোমাকে মদ খাওয়া ছাড়তে হবে, শরীরে ট্যাটুবাজি বন্ধ করতে হবে, নোংরা কাজকর্ম ছেড়ে দিতে হবে। তোমার চাকরি হারার সম্ভাবনা আছে, তোমার পরিবার তোমাকে ত্যাগ করতে হ'তে পারে, পারবে?

টেরি ভেবে দেখলেন, হ্যাঁ, তিনি পারবেন, ইসলামের আলো যার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সে কেনইবা পারবে না দুনিয়ার চাকচিক্য ছেড়ে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরতে? অবশেষে ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে টেরি কারাবন্দীদের মাঝে আরবিতে ঘোষণা দিলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল'। সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

টেরি মদপান ছেড়ে দিলেন, গান-বাজনাও ছেড়ে দিলেন। টেরির ইসলাম গ্রহণের কথা তার সহকর্মীরা জানলে সমস্যা হ'তে পারে মনে করে তাকে লুকিয়ে ছালাত পড়তে হ'ত, ঘনঘন তাকে বাথরুমে যেতে হ'ত।

২০০৪ সালে টেরিকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় 'general Personality disorder'-এর অজুহাতে।

টেরি হোল্ড্রুক গুয়ানতানামোর সেই অল্প কিছু কারারক্ষীদের একজন যারা কিনা আমেরিকার শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার মিথ্যা আশ্বাসকে তুলে ধরছেন সবার সামনে। তিনি বলেছেন, আমেরিকানদের লজ্জা পাওয়া উচিত এই জঘন্য কারাগারের মালিক হওয়ার জন্য। তিনি বর্তমানে তাই কাজ করে যাচ্ছেন মুসলিম লিগ্যাল ফান্ড অফ আমেরিকার সাথে। যে সকল আমেরিকান নাগরিক অন্যায়ভাবে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে বন্দী হয়ে আছেন কারাগারে, তাদের মুক্তির জন্য তারা ফান্ড তুলছেন এবং আইনগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের সিনিয়র নায়েবে আমীরের মৃত্যু

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের সিনিয়র নায়েবে আমীর, ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল জম্মু-কাশ্মীরের সদস্য এবং চাঁদ দেখা কমিটির সদস্য মাওলানা আব্দুল আযীয হানীফ (৭৫) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গত ৯ই সেপ্টেম্বর'১৬ মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। ঈদুল আযহার পূর্বের জুম'আর খুৎবায় যখন তিনি হামদ ও ছানার পর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অতুলনীয় ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাস বর্ণনা করছিলেন, ঠিক সে অবস্থায় তিনি মিম্বরের উপর ঢলে পড়েন। পরদিন সকাল ১১-টায় ইসলামাবাদ কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাঁর প্রথম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মারকাযী জমঈয়তের আমীর প্রফেসর সাজেদ মীর। এতে অংশগ্রহণ করেন পাকিস্তানের মন্ত্রী ড. তারেক ফযল চৌধুরী, জামাআতে ইসলামী আযাদ কাশ্মীরের নেতা আব্দুর রশীদ তুরাবী, 'আনছারুল উম্মাহ'-এর আমীর ফযলুর রহমান খলীল, জমঈয়তে ওলামায়ে পাকিস্তানের মুফতী যমীর আহমাদ সাজিদ, জমঈয়তে ওলামায়ে ইসলাম-এর মাওলানা নাযীর আহমাদ ফারূকী, জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারস থেকে শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুল আযীয আলাভী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস প্রমুখ। মরহূম-এর পুত্র মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক সঊদী আরব থেকে এসে বিকাল ৩-টায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জানাযায় ইমামতি করেন। অতঃপর এইচ/১১ ইসলামাবাদ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মাওলানা আব্দুল আযীয হানীফ ১৯৪৪ সালে আযাদ কাশ্মীরের বাগ যেলার নেপালী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ম্যাট্রিক পর্যন্ত স্কুলে পড়াশুনা করেন। অতঃপর দ্বীনী জ্ঞান হাছিলের জন্য ১৯৫৯ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে এসে মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ইসমাঈল যাবীহ প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা তাদরীসুল কুরআন ওয়াল হাদীছে তিন বছর দরসে নিযামীর পাঠ গ্রহণ করেন। উক্ত মাদরাসাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফীর (১৮৯৭-১৯৬৮) জামে'আ মুহাম্মাদিয়া, গুজরানওয়ালায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ফারেগ হন। এরপর তিনি করাচীতে গিয়ে আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ কলকাত্তাবীর (১৯০০-১৯৭০) নিকটে হাদীছে তাখাছ্ছুছ করেন। সাথে সাথে করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী ফাযেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ফারেগ হওয়ার পর তিনি কলকাত্তাবীর মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৭২ সালের ২রা অক্টোবর তিনি মারকাযী জমঈয়তের তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল মিয়াঁ ফযলে হকের (১৯২০-১৯৯৬) পরামর্শে ইসলামাবাদে চলে যান। সেখানে তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের ফলশ্রুতিতে মারকাযী জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই ছিল ইসলামাবাদের প্রথম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ। সুদীর্ঘ ৪৪ বছর যাবৎ তিনি উক্ত মসজিদে খতীবের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলামাবাদে আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পায়। তিনি যখন ইসলামাবাদে এসেছিলেন তখন সেখানে আহলেহাদীছদের একটি মসজিদও ছিল না। অথচ এখন সেখানে চল্লিশের অধিক আহলেহাদীছ মসজিদ রয়েছে। ইসলামাবাদের মসজিদ ও মিহরাবগুলি চিরদিন তাঁকে স্মরণ করবে। ১৯৭৪ সালে তিনি তাহরীকে খতমে নবুঅতে সরব অংশগ্রহণ করেন এবং সপ্তাহখানেক কারাগারে বন্দী থাকেন।

২০০২ সালের ৪ঠা আগস্ট তাঁকে জমঈয়তের সভায় যথারীতি সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত করা হয়। পরে তিনি সিনিয়র নায়েবে আমীর নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু সুন্দরভাবে তাঁর সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন।

রিযিক

অফিসের এক কলিগকে দশ হাযার টাকা দিতে হবে এক প্রয়োজনে। তো তিনি দুপুরে টাকাটা চাইলেন। অফিসের কাছেই বুথ আছে। তাই আমি উনাকে টাকা দেয়ার জন্য ব্যাংকের বুথে গেলাম।

বুথে কার্ড ঢুকিয়ে সব কাজ সম্পন্ন করলাম। কার্ড বেরিয়ে এলো। টাকা এলো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার ট্রাই করতে গেলাম। কার্ড আটকে গেলো। সিকিউরিটি বলল, বিকাল ৪-টার পরে এসে কার্ড নিতে হবে আপনার। টাকা ছাড়াই অফিসে গেলাম।

উনাকে ঘটনা বলার পর উনি বললেন যে, ঠিক আছে। আপনি পরে টাকা উঠিয়ে বিকাশ করে দিয়েন। উনি চলে গেলেন। টাকাটা দেয়া হ'ল না।

তারপর বিকাল ৪টায় ব্যাংকে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কার্ড বের করতে সক্ষম হলাম। ১০ হাযার টাকাও তুললাম বুথ থেকে। বুথের আশপাশে কোনো বিকাশের দোকান নেই। তাই টাকা নিয়ে আবার অফিসে যেতে হ'ল। ভাবলাম, অফিস থেকে যাওয়ার পথে বসুন্ধরা গেইট থেকে বিকাশ করব।

অফিস থেকে বের হওয়ার সময় আমার সাথে আরেক কলিগ বের হ'লেন। দু'জনই হেঁটে হেঁটে বসুন্ধরার গেইটের দিকে যাচ্ছি। হাঁটতে হাঁটতে উনি বল্লেন যে, উনার খুব যরূরী এক হাযার টাকা লাগবে। বললাম, সমস্যা নাই, ব্যাংক এশিয়ার সামনে দিয়েই তো যাব। বুথ থেকে তুলে দিব, কেমন। তখনও আশপাশে বিকাশের দোকান না থাকায় বিকাশ করা হ'ল না।

ব্যাংক এশিয়ার বুথের সামনে গিয়ে দেখি বিশাল লাইন। বললাম, সামনে আরও বুথ আছে সমস্যা নেই। হেঁটে হেঁটে ইস্টার্ন ব্যাংকের বুথের সামনে এলাম। ভাবলাম এখান থেকে এক হাযার টাকা তুলে উনাকে দিয়ে দেই। কিন্তু উনি ফোনে কথা বলতে বলতে সামনেই হাঁটছেন। ডাক দিলাম, শুনলেন না। ব্যাপার, নাহ! সামনে আরও বুথ আছে। হাঁটতে শুরু করলাম। বিকাশটা তখনও করা হয়নি।

বসুন্ধরার গেইটের কাছাকাছি এসে ডাঁচবাংলার বুথ পেলাম। ভেতরে ঢুকতে যাওয়ার আগেই দেখলাম আরেকজন হতাশ হয়ে বের হচ্ছে। জানতে পারলাম, বুথ নষ্ট। এদিকে আমি ঢুকব যমুনায়। আর উনি যাবেন অন্যদিকে। তাই শেষে আরেক জনের জন্য রাখা ১০ হাযার থেকে এক হাযার টাকা উনাকে দিয়ে আমি ঢুকে গেলাম যমুনায়। ফলে ১০ হাযার টাকার রাউন্ড ফিগার নষ্ট হয়ে গেল। আর তাই চোখের সামনে বিকাশের দোকান থাকা সত্ত্বেও টাকাটা পাঠানো সম্ভব হ'ল না।

যমুনায় জিপি সেন্টারে একটা কাজ ছিল। সেটা শেষ করে যমুনা থেকে বের হওয়ার সময় ভাবলাম ভেতরের বুথ থেকে আর এক হাযার টাকা তুলে নেই। তারপর বাইরে বেরিয়ে বিকাশে পাঠিয়ে দিব। কিন্তু যমুনার গ্রাউন্ড ফ্লোরে ব্রাক ব্যাংকের বুথে গিয়ে দেখলাম দরজায় সাইনবোর্ড ঝুলানো। যান্ত্রিক সমস্যার কারণের সাময়িকভাবে বন্ধ। যমুনা থেকে বেরিয়ে গেলাম। সামনে অসংখ্য বিকাশের দোকান। কিন্তু পকেটে ৯ হাযার টাকা। তাই বিকাশ করতে পারলাম না।

কুড়িলের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। এদিকে আমার কাজিন উত্তরা থেকে একটু পরে বাইকে বিশ্বরোড আসবে। তার সাথে মিরপুর যাবো। তার আসতে দেরি হওয়ায় আমি বুথ খুঁজতে খুঁজতে বিশ্বরোডের দিকে হাঁটছি। পথিমধ্যে একজনের সাথে দেখা হ'ল।

এক দোকানে বসে চা খেলাম। তাকে বিদায় দেয়ার পরেই আরেকটা VISA এক্সেপ্টেড বুথ চোখে পড়লো। বুথের আশপাশে বিকাশের দোকানও আছে। দেখে খুশি হয়ে গেলাম। ভাবলাম বুথ থেকে এক হাযার টাকা তুলে ১০ হাযার মিলিয়ে এখনই বিকাশ করে দিব। কিন্তু বুথে ঢুকে কয়েকবার ট্রাই করেও টাকা তুলতে পারলাম না। অবাক হওয়ার কিছু নেই। যান্ত্রিক ব্যাপার, এমন হতেই পারে। তাই বিকাশও করা হ'ল না।

আবার সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। একটু সামনে গিয়েই আরেক ব্যাংকের বুথ পেলাম। মনে মনে হতাশা নিয়ে ঢুকলাম। বের হলাম সফল হয়ে। ১ হাযার টাকা তুলে এখন ১০ হাযার টাকা হ'ল। কিন্তু আশপাশে বিকাশের দোকান নেই। তাই টাকাটা পাঠাতে পারলাম না। বিরক্ত হচ্ছি না। কারণ, কোনো না কোনোভাবে টাকাটা তো পাঠানো যাবেই।

এবার বিশ্বরোডের কাছাকাছি এসে রাস্তার বিপরীতে বিকাশের দোকান চোখে পড়ল। ভাবলাম, কাজিন জুয়েল যেহেতু এখনও আসেনি, তাহ'লে এই ফাঁকে এখান থেকে বিকাশটা করেই যাই। রাস্তা পার হতে যাব, তখনি জুয়েলের ফোন আসল।

বলল- শাকীর! আমি বিশ্বরোডে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। পুলিশবক্সের সামনে আছি। জুয়েলের ফোন পেয়ে ভাবলাম, মিরপুর যেয়েই বিকাশটা করব। তাই বিকাশের দোকানে আর গেলাম না। টাকাটাও পাঠানো হ'ল না।

বাইকে উঠে জুয়েলকে বললাম, আমার যরূরী একটা বিকাশ করতে হবে। কোথাও বিকাশের দোকান দেখলে বাইক যেনো থামায়। বাইকে কালশি পার হয়ে মিরপুর ১১ এর দিকে এক গলিতে ঢুকলাম। একটা বিকাশের দোকান দেখে জুয়েল বাইক থামাল। বাইক থেকে নামতে গিয়ে খেয়াল করলাম, দোকানটায় অনেক ভীড়। বললাম, চল অন্য দোকানে যাই। এখানে দেরি হবে। ফলে এখানেও বিকাশ করা হ'ল না।

আবার বাইকে আরেকটু সামনে গেলাম। তখন প্রায় রাত ৮টা বাজে। আরেকটা বিকাশের দোকানে থামলাম। দোকানটা অনেক ছোট। অল্পবয়স্ক একটা ছেলে বসা দোকানে। বেশ স্মার্ট। চুলের স্টাইলও যথেষ্ট অদ্ভুত। সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, টাকা পাঠানো যাবে? ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, কত? বললাম, ১০ হাযার। শুনেই ছেলেটা আনন্দে লাফ দিয়ে উঠল। হাসতে হাসতে আমাকে জিজ্ঞেস করল, ভাই চা খাবেন?

আমি একটু থতমত খেয়ে বললাম, ঘটনা কী ভাই? এত খুশি হ'লেন যে? ছেলেটা হাসতে হাসতে বলল, আরে ভাই! আপনাকেই তো খুঁজছি বিকাল থেকে। আমার ১০ হাযার টাকা ক্যাশ খুব দরকার, খুব। বিকাল থেকে আল্লাহ আল্লাহ করছি আর ভাবছি, কেউ যেন আমার দোকান থেকে আজকে ১০ হাযার টাকা পাঠায়।

আমি তার কথা শুনে প্রচণ্ড শকড! এতক্ষণ টাকাটা পাঠাতে যত বাধার সামনে পড়েছি, সবই স্বাভাবিক লাগছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সবকিছু কেমন জানি অস্বাভাবিক লাগতে শুরু করল। ছোট ছোট বাধাগুলি বড়বড় মনে হতে শুরু করল।

ছেলেটাকে শুধু বললাম, আপনার জন্যই আজকে আমাকে এত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ছেলেটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি কী করলাম ভাই! বললাম, তেমন কিছু না, আসলে যেটা আপনার কপালে ছিল, সেটা কপালেই এসেছে। যাই হোক, টাকাটা সেন্ড করেন এবার।

শেষে ১০ হাযার টাকা বিকাশ করে বাসায় গেলাম। সারাটা রাত আমার মাথায় শুধু এই সবই ঘুরপাক খাচ্ছিল। ভাবছিলাম, এই ১০ হাযার টাকা বিকাশ করাতে নিশ্চয় তার একটা লভ্যাংশ ছিল। আর এটাই হ'ল তার রিযিক্ব।

এমন অনেক ব্যাপারেই বিভিন্ন ঝামেলা হয়ে আমাদের এক দোকানের খরচ আরেক দোকানে চলে যায়। আমরা সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে নেই। মূলত এর ভেতরে অস্বাভাবিক অনেক কিছুই থাকে। আসলে যে যেটার প্রাপ্য, সে সেটা পাবেই এবং তা যে কোনভাবে, যে কোন মূল্যেই।

-শাকির আহসানুল্লাহ, ঢাকা।

জর্দান

-মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

ভূমিকা : মুসলিম ঐতিহ্যের লীলাভূমি নামে খ্যাত এশিয়া মহাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম একটি দেশ জর্দান। মুসলিম দেশ পরিচিতির এ পর্বে নিম্নে জর্দান নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

নাম : আরবী (الأردن) 'আল-উর্দুন' বা হাশেমীয় জর্দান রাজ্য। 'আল-মামলাকাতুল উর্দুনিয়াল হাশিমিয়া' (المملكة الاردنية الهاشمية)-এর সম্পূর্ণ নাম। এটি মধ্যপ্রাচ্যের একটি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জর্দানের রাজবংশ নিজেদেরকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পিতামহ হাশেমের বংশধর মনে করে। রাষ্ট্রীয় নাম- 'হাশেমী রাজতন্ত্র জর্দান'। ইংরেজীতে যার নাম The Hashemite kingdom of Jordan।

রাজধানী ও অবস্থান : জর্দানের রাজধানীর নাম 'আম্মান'। এটি জর্দানের বৃহত্তম শহর। লোকসংখ্যা ১.০৮৮ মিলিয়ন। জর্দানের অবস্থান হ'ল পূর্বে ইরাক,পশ্চিমে ইসরাঈল ও পশ্চিম তীর এবং ডেড সী, উত্তরে সিরিয়া এবং দক্ষিণে সঊদী আরব ও আকাবা গলফ বা আকাবা উপসাগর ।

উল্লেখ্য, ইংরেজী Gulf-এর অর্থ উপসাগর। আকাবা গলফ অর্থ আকাবা উপসাগর। যা লোহিত সাগরের একটি উপসাগর। লোহিত সাগর ভারত মহাসাগরের একটি অংশ, যা আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশকে পৃথক করেছে। সাগরটির দক্ষিণে অবস্থিত বাব এল মান্দের প্রণালী ও এডেন উপসাগরের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরের সাথে যুক্ত সাগরটির উত্তরাংশে সাথে সিনাই উপদ্বীপ, আকাবা উপসাগর এবং সুয়েজ উপসাগর অবস্থিত।

আয়তন ও জনসংখ্যা : মোট আয়তন ৩৪,৪৯৫ বর্গমাইল বা ৮৯,৩৪২ বর্গ কিঃ মিঃ। ২০১২ সালের হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা ৭,৭৪,৫০০ জন। যাদের অধিকাংশই ফিলিস্তীনী মুসলিম, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আ আক্বীদার অনুসারী। জন্মহার ২৬.৫২। গড় আয়ু ৮০ বছর। জর্দানের মুদ্রার নাম দিনার। প্রধান ভাষা আরবী। তবে ইংরেজী ভাষাও প্রচলিত আছে।

জর্দান অধিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস :

জর্দানকে বলা হয় আধুনিক আরব রাষ্ট্র। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯২% মুসলিম (সুন্নী), ৬% খ্রীষ্টান, ২% দারাজিয়া, কিছু বাহাঈ গোত্র ও অন্যান্য।

উল্লেখ্য যে, 'দারাজিয়া'-দের ধর্ম বিধানে ইবরাহীমী ধর্মের পাশাপাশি নিউপ্লাতিনিক এবং পিথাগোরীয় মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দারাজিয়াদের সামাজিক রীতিনীতি মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের থেকে ভিন্ন। নিম্নে দারাজিয়াদের পরিচয় ও আক্বীদা বিধৃত হ'ল-

'দারাজিয়া'-এর পরিচয় :

দারাজিয়া একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম এবং সামাজিক সম্প্রদায়। এই ধর্মকে পৃথক ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। কারণ এটি মূলত শী'আ সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দারাজিয়াগণ নিজেদেরকে 'আহলে তাওহীদ' বা একেশ্বরবাদী মানুষ হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকে। এদের আবাসস্থল মূলত জর্দান, সিরিয়া, লেবানন ও ইসরাঈল।

দারাজিয়া আক্বীদার উৎস :

দারাজিয়া নামটি এসেছে মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল নাশতাকিন আদ-দারাজির নাম থেকে। যিনি এই মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক। 'দারাজি' শব্দটি ফারসী। 'আদ-দারাজি' ছিলেন একজন সাধু ও প্রচারক। দারাজিয়াগণ আদ-দারাজিকে ধর্মগুরু মানে এবং নিজেদেরকে দ্রুজ বলে পরিচয় দেয়। আদ-দারাজি নিজেকে 'বিশ্বাসের তরবারী' বলে ঘোষণা করেন।

দারাজিয়াদের আক্বীদা :

দ্রুজ অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টিকর্তা মানুষের মাঝে বিরাজ করেন। বিশেষ করে আলী (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের মাঝে। ফাতেমীয় খলীফা আল-হাকীম বিন আমর এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র মাঝেও সৃষ্টিকর্তা আছেন বলে প্রচার করেন। দারাজিয়াগণ আল-হাকিম বিন আমরকে 'ঈশ্বর প্রেরিত দূত' বলে মনে করে।

দারাজিয়াদের অবস্থান :

'ইনস্টিটিউট অব দ্রুজ' -এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ৫০% দারাজিয়া সিরিয়া, ৪০% লেবাননে, ৬-৭% ইসরাঈলে এবং ১-২% জর্দানে বসবাস করে। মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় দারাজিয়া অনুসারীগণ বসবাস করেন। পৃথিবীতে দারাজিয়া অনুসারীর সংখ্যা দশ লাখেরও বেশী। দ্রুজগণ আরবীতে কথা বলে এবং প্রাচ্য ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করে। দারাজিয়াগণ মূলত জর্দানের পূর্বাঞ্চলীয় শহর 'আজবাক' ও 'জারকাতে' বসবাস করে থাকে।

বাহাঈ ধর্ম :

'বাহাঈ' ধর্ম হচ্ছে 'বাহাউল্লাহ' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদী একটি ধর্ম। উল্লেখ্য বাহাউল্লাহ (নভেম্বর ১২, ১৮১৭- মে ১৮৯২) বাহাঈ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। জন্মসূত্রে তার নাম ছিল মির্যা হুসাইন আলী।

বাহাঈ আক্বীদার উৎস :

'বাহাঈ' শব্দটি একটি বিশেষণ হিসাবে বাহাঈ বিশ্বাস বা ধর্মকে নির্দেশ করতে তথা 'বাহাউল্লাহ্'-এর অনুসারীদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটি উদ্ভূত হয় আরবী 'বাহা' থেকে, যার অর্থ মহিমা করা উজ্জ্বলদীপ্তি। ধর্মটিকে নির্দেশ করতে পূর্বে 'বাহাঈজম' বা 'বাহাঈবাদ' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে ধর্মটির সঠিক নাম 'বাহাঈ ধর্ম'।

বাহাঈদের আক্বীদা :

'বাহাঈ ধর্মের' প্রতিষ্ঠাতা বাহাউল্লাহ্‌র মতে- পয়গম্বরদের ধারার তিনি সমাপ্তি তথা পূর্ণতা এনেছেন। এমনকি তিনি নিজেকে ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিকশিত রূপ বলেও দাবী করেছেন (নাঊযুবিল্লাহ)।

উনবিংশ শতাব্দীতে পারস্যে (বর্তমানে ইরান) এই ধর্মের উৎপত্তি। মূলত আত্মিক ঐক্য হচ্ছে এই ধর্মের মূল ভিত্তি।

বিশ্বে বর্তমানে ২০০-এর বেশী দেশ ও অঞ্চলে এই ধর্মের আনুমানিক ৬০ লক্ষ অনুসারী রয়েছে।

বাহাউল্লাহ অনেকগুলো ধর্মীয় পুস্তক রচনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'কিতাব-ই-আক্বদাস' এবং 'কিতাব-ই-ইক্বান'। তিনি প্যালেস্টাইনের বাহজি অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তার সমাধি অবস্থিত। এ অঞ্চলটি বর্তমানে ইসরাঈলের অন্তর্গত।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার একটি ছোট্ট আরব দেশ জর্দান। লূত (আঃ)-এর আবাসভূমি হিসাবে পরিচিত জর্দান সবসময় মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এবং ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হ'তে এখনো কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

প্রাচীনকালে এ এলাকায় সাদূম, আমূরা, দূমা, ছা'রাহ ও ছা'ওয়াহ নামে পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। এ পাঁচটি শহরের মধ্যে 'সাদূম' ছিল সবচেয়ে বড় এবং সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হ'ত। লূত (আঃ) এখানেই অবস্থান করতেন। তখন এ স্থানটি ছিল স্বাভাবিক এবং মানুষ বসবাসের জন্য খুবই উপযোগী। তৎকালীন লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় শিরক ও কুফরী ছাড়াও সমকামিতার মত নিকৃষ্ট ও জঘন্যতর পাপকাজে লিপ্ত হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কোন জাতির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি। জন্তু-জানোয়ারের চাইতেও নীচ, লজ্জাহীন ও হঠকারী এই সম্প্রদায়ের মানুষদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ লূত (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনি বিফল মনোরথ হয়ে অবশেষে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করলেন। ফলে যথারীতি গযব নেমে এল।

আল্লাহ্র হুকুমে কয়েকজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে লূত (আঃ)-এর বাড়ীতে আসলেন। অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে পরদিন অতি প্রত্যুষে গযব কার্যকর করা হয়। লূত (আঃ) ও তাঁর সাথীগণ যখন নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছেন তখন জিবরীল (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ পাওয়া মাত্র ছুবহে ছাদিক-এর সময় একটি প্রচন্ড নিনাদের মাধ্যমে তাদের শহরগুলোকে উপরে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে দিলেন এবং সাথে সাথে প্রবল বেগে ঘূর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হয়। এটা ছিল তাদের কুকর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তি। কেননা তারা যেমন আল্লাহ্র আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উল্টিয়েছিল অর্থাৎ মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধভাবে সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল ঠিক তেমনি তাদেরকেও মাটি উল্টিয়ে উপুড় করে শাস্তি দেওয়া হ'ল।

'কওমে লূত'-এর ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে 'বাহরে মাইয়েত' বা 'বাহরে লূত' অর্থাৎ 'মৃত সাগর' বা লূত সাগর নামে খ্যাত। যা ফিলিস্তীন ও জর্দান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল অঞ্চল জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে। আজকের এইডস আক্রান্ত বিশ্বের জন্য এটি একটি জীবন্ত নিদর্শন। অতঃপর বহুকাল যাবত ধ্বংসস্থলটির আশেপাশে কোন মনুষ্য বসতী গড়ে উঠেনি।

পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন এলাকা হ'তে মানুষ ধ্বংসস্থলের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে, যা বর্তমানে জর্দান এবং ধ্বংসস্থলটি 'ডেডসী' বা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত। ডেডসীর আয়তন দৈর্ঘ্য ৭৭ কিঃ মিঃ (প্রায় ৫০ মাইল), প্রস্থ ২২ কিঃ মিঃ (প্রায় ৯ মাইল) এবং গভীরতায় ২০০ মিটার। বর্তমান ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, এর উপকূলীয় স্থলভাগ পৃথিবীর সবচেয়ে নিম্নতম স্থলভূমি, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪২০ মিটার (১৩৭৫ ফুট) নীচে। এর পাশ দিয়ে চলে গেছে বিশ্বের সবচেয়ে নীচু হাইওয়ে 'হাইওয়ে ৯০'। এই হাইওয়েটি ইসরাঈল এবং পশ্চিম তীরের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। এর পানিতে তৈল জাতীয় পদার্থ বেশী এবং সমুদ্রের পানির চাইতে প্রায় ৯ গুণ (৮.৬) বেশী লবণাক্ত। পানির ঘনত্বের কারণে মানুষ অনায়াসে এতে ভেসে থাকতে পারে। এতে কোন মাছ, ব্যাঙ এমনকি কোন জলজ প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'মৃত সাগর' বা 'মরু সাগর' বলা হয়েছে। এখানকার মাটিতে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া। Natron ও পেট্রোল তো আছেই। এই গন্ধকও আকাশ হ'তে উল্কা পতনের অকাট্য প্রমাণ বহন করে।

বর্তমান জর্দান :

মরুময় দেশ জর্দান ওছমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। জর্দান এতদঞ্চলে সঊদী আরব সহ অনেক নতুন রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যতম। এসব রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল ১৯১৬ সালের ওছমানীয় বা অটোমান টার্কদের (তুর্কি) বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহের ফসল হিসাবে। ঐ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রবাহিনীর অন্যতম ব্রিটিশ, সামরিক বাহিনীর সদস্য টমাস 'এডওয়ার্ড লওরেন্স' বা আরব ইতিহাসখ্যাত 'লওরেন্স অব এ্যারাবিয়া'র মরু গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব যেমন আরব বিদ্রোহ সফল করেছিল, তেমনি অটোমান সাম্রাজ্যের ইতি টেনেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ১০০ বছর আগে এতদঞ্চলের নকশার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল, যার অন্যতম ফসল জর্দান।

১৯২২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে পরিচালিত স্বাধীন হাশেমী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের পরও এই রাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশী। জর্দানের সঙ্গে সিরিয়া, ইরাক, সঊদী আরব ও ইসরাঈল এবং বর্তমানে প্যালেস্টাইন অথরিটি দ্বারা সীমিতভাবে শাসিত পশ্চিম তীরের সঙ্গে অভিন্ন সীমানা রয়েছে। এছাড়া মিশরের সঙ্গে আকাবা গলফের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগও রয়েছে।

১৯৪৬ সালের ২২ শে মার্চ লন্ডনে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বৃটেন একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ট্রান্স জর্দানকে স্বীকৃতি দেয়। ঐ বছর ২৫ শে মে আমীর আব্দুল্লাহ উপাধি ধারণ করেন এবং তাকে হাশেমী রাজতন্ত্র জর্দানের রাজা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, মক্কায় জন্মগ্রহণকারী আব্দুল্লাহ বিন আল হুসাইন ১৯০৯ সালে থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মক্কার প্রতিনিধি হিসাবে ওছমানীয় সাংসদের দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশের সাথে মিত্রতা স্থাপনে বৃটিশ সামরিক কর্মকর্তা টি.ই লরেন্সের সাথে কাজ করেন। ওছমানীয়দের বিরুদ্ধে সংঘটিত আরব বিদ্রোহের তিনি অন্যতম স্থপতি ও পরিকল্পক।

১৯২১ থেকে তার মৃত্যু ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি জর্দানের স্বাধীন রাজা হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর তার ছেলে দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীনের অংশ বিশেষে ইসরাঈল স্বাধীনতা ঘোষণা করলে জর্দান আরও চারটি আরব রাষ্ট্রের সাথে

Contents

ইসরাঈলীদের আক্রমণ করে। যুদ্ধশেষে ইসরাঈলীরা পশ্চিম জেরুজালেম এবং জর্দানরা পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম দখলে আনে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে সংঘটিত ৬ (ছয়) দিনের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে ইসরাঈল পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীর দখল করে নেয়। পরবর্তীতে জর্দান পশ্চিম তীরকে জর্দানের অংশ হিসাবে দাবী করতে থাকলেও স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তীনীদের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালে জর্দানের রাজা পশ্চিম তীরের উপর থেকে দাবি প্রত্যাহার করে নেয়।

সংবিধান ও সরকারব্যবস্থা :

জর্দানে রাজতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান। দুইকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ৮০। সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সিনেটের সদস্য সংখ্যা ৩০। সদস্যরা বাদশাহ কর্তৃক মনোনীত হন।

মন্ত্রীপরিষদ তার কাজের জন্য পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। রাজা বা রাণীর বিরুদ্ধে সমালোচনা নিষিদ্ধ। রাজা -রাণী কিংবা রাজ পরিবারের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা সমালোচনার জন্য তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

সংবিধান :

১৯৫২ সালে প্রণীত জর্দানের সংবিধানে বাদশাহর প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বাদশাহ দেশের প্রধান নির্বাহী এবং দেশের সামরিক বাহিনীর প্রধান। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের মাধ্যমে বাদশাহ তার মতামত প্রয়োগ করে থাকেন। তিনিই বিচারকদের নিয়োগ, চুক্তি অনুমোদন, যুদ্ধ ঘোষণা, সামরিক বাহিনীর নিয়োগ দেন। মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত, আদালতের রায় ও জাতীয় মুদ্রা তার নামেই ইস্যু করা হয়। দেশের মন্ত্রী পরিষদের নেতৃত্ব দেন একজন প্রধানমন্ত্রী, যাকে নিয়োগ দেন বাদশাহ।

সংবিধান অনুযায়ী দেশেটিতে তিন ধরণের আদালত রয়েছে। বেসামরিক, ধর্মীয় এবং বিশেষ আদালত। বেসামরিক আদালত বেসামরিক অপরাধ এবং সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করে থাকে। ধর্মীয় আদালত সাধারণত বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার, সন্তানের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিচারকাজ সম্পন্ন করে থাকে। মুসলিম ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই এ ধর্মীয় আদালত রয়েছে। আর বিশেষ আদালত দেশটির বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে বিচার সম্পাদন করে থাকে। দেশের বিচার বিভাগ অন্য বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন।

প্রশাসনিক বিভাগ :

প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য জর্দানকে ১২টি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান হ'লেন এক একজন গভর্নর, যাকে নিযুক্তি করে থাকেন দেশের বাদশাহ। গভর্ণর তার প্রদেশের সব সরকারী বিভাগ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের একমাত্র কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হন।

পার্লামেন্ট :

জর্দানের পার্লামেন্ট 'মজলিসে উম্মাহ' নামে পরিচিত। এটি দুই কক্ষ বিশিষ্ট। এর একটি হচ্ছ 'দ্য চেম্বার অব ডেপুটি বা 'মজলিসে নওয়াব', আরেকটি হচ্ছে 'সিনেট' বা 'মজলিসে আয়ান'। 'দ্য চেম্বার অব ডেপুটি'-এর সদস্য সংখ্যা ৮০ জন। ১২টি প্রদেশ থেকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত এই ৮০ জনের মধ্যে ৭১ জন হবেন মুসলিম এবং ৯ জন হবেন খ্রীষ্টান সম্প্রদায় থেকে। 'সিনেটে'র ৫৫ সিনেটরের সবাই বাদশাহ কর্তৃক মনোনীত। উভয় সদস্যরাই চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। 'দ্য চেম্বার অব ডেপুটি'-এর সদস্যরা কোন ভাবেই বাদশাহর আত্মীয় হ'তে পারবেন না এবং সরকারের কোন আর্থিক ব্যবস্থাপনা থেকে উপকার ভোগী হ'তে পারবেন না। দেশের পার্লামেন্ট শূণ্য হয়ে গেলে তখন বাদশাহই দেশ পরিচালনা করে থাকেন।

রাজনৈতিক দল : স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জর্দানে রাজনৈতিক দল এবং বিরোধী দলীয় সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিল । ১৯৮৯ সালে রাজনৈতিক দল এবং বিরোধী কার্যক্রম বৈধ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান জর্দানে ৩০টির মত দল বিদ্যমান। দেশটিতে চার ধরনের প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দল রয়েছে। যেমন-ইসলামিক, বামপন্থী, আরব জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিক। এছাড়া স্বতন্ত্রধারার কিছু রাজনৈতিক দল থাকলেও অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে অস্পষ্ট অবস্থান ও পরিষ্কার প্লাটফর্মের অভাবে তারা দেশের রাজনীতিতে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনা।

জর্দানের বাদশাহ ও রাজনৈতিক জীবন :

বৃটেনের সহায়তায় ১৯২১ সালে জর্দানে রাজতন্ত্র স্থাপিত হ'লে ট্রান্স জর্দানের আমীর হন প্রথম আব্দুল্লাহ বিন আল-হুসাইন। ১৯৪৬ সালের ২৫ মে ট্রান্সজর্দান স্বাধীন হয়ে নতুন জর্দান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মক্কায় জন্মগ্রহণকারী আব্দুল্লাহ আমীর ছিলেন। এরপর তিনি জর্দানের প্রথম বাদশাহ হন। ১৯৫১ সালে বাদশাহ আব্দুল্লাহ আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর তার ছেলে বাদশাহ তালাল জর্দানের শাসনভার হাতে নেন।

উল্লেখ্য যে, বাদশাহ আব্দুল্লাহ ১৯৫১ সালের ২০ জুলাই জেরুজালেমের আল-আক্বছা মসজিদ পরিদর্শনের সময় হুসাইনি গোত্রের এক ফিলিস্তীনীর আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

১৯৫২ সালে বাদশাহ তালালের মানসিক অসুস্থতার জন্য তাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। সে সময় তার সন্তান 'হুসাইন'-এর বয়স কম থাকায় একটি কমিটির মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হয়। যখন হুসাইন ১৮ বছর বয়সে পৌঁছেন, তখন তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। বাদশাহ হুসাইন জর্দানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তিনি ১৯৯১ সালে 'মার্শাল ল'র সমাপ্তি ঘটান এবং ১৯৯২ সাল রাজনৈতিক দলের অনুমোদন দেন। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে তার মৃত্যুর পর বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ ক্ষমতায় আসেন। বর্তমানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ।

শিক্ষা ব্যবস্থা :

জর্দানের শিক্ষা ব্যবস্থা আরব বিশ্বের মধ্যে প্রথম স্থানের দাবিদার এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে শীর্ষ তালিকায় থাকা অন্যতম এক শিক্ষা ব্যবস্থা। জর্দানের বার্ষিক বাজেটের ২০.৫

শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ। যেখানে তুরস্ক ও সিরিয়ায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দ মাত্র ২.৫ শতাংশ করে। জর্দানের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকে বেশী নযর দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে দেশটির শিক্ষার হার ৯১.১ শতাংশ।

জর্দানের শিক্ষা ব্যবস্থায় ৫টি স্তর। ২ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা। এরপর দশ বছরের মৌলিক শিক্ষা। রয়েছে ২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা ডিপ্লোমা। Tawjihi (সাধারণ মধ্যশিক্ষা সার্টিফিকেট)। এরপর রয়েছে ব্যাচেলর ডিগ্রী প্রোগ্রাম। একটি ব্যাচেলর ডিগ্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৪ (চার) বছরের হয়। তবে দন্তচিকিৎসা, ফার্মেসি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ৫ বছর, মেডিসিন ৬ (ছয়) বছর হয়। এরপর ২ বছরের মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ফরাসি ও জার্মান সিস্টেম অনুসরণ করে DEA মাস্টার্স ডিগ্রী দিয়ে থাকে। স্বাক্ষরতার হার ৯২.৬% (২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী)।

সামরিক বাহিনী :

জর্দানের রয়েছে এক বিশাল সামরিক বাহিনী। ১৯২০ সালের ২২ অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত সামরিক বাহিনীর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১,১০,৭০০, যার মধ্যে স্থলবাহিনী ৬০,০০০। তাদের রয়েছে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে জর্দান আর্মি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জীবনযাত্রার মান :

২০০৮ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী জর্দানে মানুষের জীবনযাত্রার মান আরব বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ মানের। শহর ও গ্রাম পর্যায়ে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা, উচ্চশিক্ষার সুবিধা, কম অপরাধ সংঘটন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়ে জীবনযাত্রার মানে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম সেরা দেশ হিসাবে জর্দান নিজের অবস্থান বজায় রেখেছে।

২০১০ সালের 'ইন্টারন্যাশন্যাল লিভিং ম্যাগাজিন'-এর দেয়া তথ্যানুযায়ী জীবনযাত্রার ব্যয়, সংস্কৃতি, অবসর, অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবেশ সচেতনতা, স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, আবহাওয়া, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি দিক দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের অন্যতম শীর্ষস্থানে রয়েছে জর্দান।

অর্থনীতি :

যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও আরব দেশগুলোর সাথে দ্বি-পক্ষীয় সম্পর্কের মাধ্যমে জর্দান অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফসফেট ও পটাশ রপ্তানি, রেমিট্যান্স, বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদি দেশটির উল্লেখযোগ্য আয়ের খাত হিসাবে গণ্য। এছাড়া আইটি ও প্রযুক্তি খাতও ধীরে ধীরে দেশটিকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মানব উন্নয়ন সূচকে জর্দানের অবস্থান বিশ্বের মধ্যে ৯৫ তম।

জর্দানের মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৫%। বর্তমানে সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে কিছু ফল-মূল ও সবজি উৎপাদিত হয়। প্রধান ফসল লেবু এবং লেবু জাতীয় অন্যান্য ফল। যেমন- টমেটো, শশা, গম, মসুর ডাল, জলপাই অন্যতম। পর্যটন দেশটির অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখে। ১৯৮২ সালে জর্দানে প্রথম তেল আবিষ্কৃত হয়। ফলে বিভিন্ন শহরে ছোট পরিসরে বিভিন্ন তেল এবং পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে উঠেছে।

প্রধান আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্য :

আমদানী দ্রব্যসমূহ হ'ল- অশোধিত তেল, টেক্সটাইল কাপড়, যন্ত্রপাতি, পরিবহন সরঞ্জাম এবং শিল্পজাত পণ্য। রপ্তানী দ্রব্য হ'ল- পোশাক, ফার্মাসিটিক্যালস, পটাশ, ফসফেট এবং কৃষিপণ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থা :

দেশটির সড়ক পথের দৈর্ঘ ৫ হাযার কিঃ মিঃ। রেলপথের দৈর্ঘ্য ৮১৮ কিঃ মিঃ। জর্দানের ৭টি বিমানবন্দর রয়েছে, তন্মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সবচেয়ে বড় 'রাণী আলিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর', আম্মান। এছাড়া একটি নৌবন্দরও রয়েছে।

আবহাওয়া :

জর্দানে প্রধানতঃ ভূ-মধ্যসাগরীয় আবহাওয়া বিদ্যমান। গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া গরম ও শুষ্ক এবং শীতকালে আবহাওয়া ঠান্ডা ও আর্দ। দেশটির পাহাড়ী এলাকায় গ্রীষ্মকালেও ঠান্ডা বিরাজ করে। সমতল এলাকায় গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম এবং শীতকালে শীতের প্রচন্ড তীব্রতা অনুভূত হয়। জানুয়ারী মাসে রাজধানী আম্মানের তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং জুলাই মাসে ৭৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠানামা করে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩০.৪৮ সেঃমিঃ।

শিল্প : জর্দানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সিমেন্ট, ইস্পাত, সার, জ্বালানী, ফসফেট, সিগারেট, বস্ত্র, পাদুকা, ব্যাটারি, প্লাস্টিক সামগ্রী, চামড়া দ্রব্য, ঔষধ, কসমেটিক প্রভৃতি প্রধান।

খনিজ সম্পদ : জর্দানের খনিজ সম্পদের মধ্যে ফসফেট, পটাশ সহ বিভিন্ন প্রকার আকরিক ও রাসায়নিক দ্রব্য।

পর্যটন : ডেডসী ও রোমান সভ্যতার অনেক নিদর্শন এখনো টিকে থাকায় সারা বছর ইউরোপ-আমেরিকা হ'তে প্রচুর পর্যটক জর্দানে ভ্রমণ করে। পর্যটন দেশটির অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

বনজ সম্পদ : জর্দানের পূর্বদিকে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে গড়ে উঠেছে শুষ্ক বন মালভূমি। তবে দেশের পশ্চিম দিকে রয়েছে ভূ-মধ্যসাগরীয় বনভূমি। ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী জর্দানের বনাঞ্চলের পরিমাণ ৮১ হাযার হেক্টর।

উপসংহার : দেশটি ফিলিস্তীনের পার্শ্ববর্তী দেশ হওয়ায় নবীদের গমনা-গমনের দেশ হিসাবেও পরিচিত। এখানে ইলিয়াস (আঃ), লূত (আঃ), ইবরাহীম (আঃ) বেশকিছু ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত স্থান রয়েছে।

তথ্যসূত্র :1.http://www.intoplease.com
2. http://www. Encyclopediabritinnica.com
3. http://www. Wikipedia.com
৪. বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৫ সালের ক্যালেন্ডার।

[লেখক : সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রংপুর সাংগঠনিক যেলা]

মেঘের রাজ্য সাজেকে

-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

বাংলাদেশের পাহাড়ী সৌন্দর্যের রাজধানী বান্দরবানে সর্বপ্রথম পা রেখেছিলাম ২০১২ সালে। তারপর গেলাম ২০১৪-এর নভেম্বরে। দ্বিতীয় সফরের পরিশ্রমের কথা স্মরণ করলে পাহাড়ের পথ মাড়ানোর ইচ্ছাটা নিমেষেই উবে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু কেন জানি কিছুদিন পার হলেই হৃদয়ের মনিকোঠায় প্রকৃতির ডাক আকুলি-বিকুলি করে। মধুর স্মৃতিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে বারবার। কষ্টের স্মৃতিগুলিকে ভুলিয়ে দিয়ে তাগাদা দেয় পূণর্যাত্রার। সেই হিসাবে আবার পরিকল্পনায় বসা। যথার্থ সফরসঙ্গী খোঁজা। আর গন্তব্য নির্ধারণ প্রচেষ্টা। সবমিলিয়ে এবারের গন্তব্য নির্ধারিত হল পাহাড়ী সৌন্দর্যের আরেক কেন্দ্রভূমি খাগড়াছড়ির সীমান্তবর্তী শহর সাজেক। আর সফরসঙ্গী আমাদের প্রায় সব দীর্ঘ ভ্রমণের সাথী এবং বহুদিনের সহপাঠী কাফী ভাই।

২৪ মে সন্ধ্যায় দেশ ট্রাভেলসে রওয়ানা হলাম চট্টগ্রামের পথে। সফরের পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে আত্মবিশ্বাসের কোন ঘাটতি নেই। ফলে ফুরফুরে মেজাজে নানা আলোচনায় দীর্ঘ ১২ ঘন্টা সময় কেটে গেল। পৌঁছে গেলাম চট্টগ্রাম।

২৫ তারিখ সকাল ৭-টায় চট্টগ্রাম নেমে সোজা ফুফাতো বোনের বাসায়। খাওয়া-দাওয়া আর সামান্য ঘুমের পর সিদ্ধান্ত নিলাম কক্সবাজার ঘুরে তারপর খাগড়াছড়ি যাবো। দুপুরে ফোন দিলাম চট্টগ্রামে চাকুরীরত আমাদের বহুদিনের সহপাঠী, রাজশাহী মহানগরী 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক সেক্রেটারী সাইফুল ইসলাম ভাইকে। চট্টগ্রামে আমাদের আগমনের সংবাদ জেনে সাইফুল ভাই প্রায় আকাশ থেকে পড়ল। তবুও বন্ধুত্বের দাবী বলে কথা। কীভাবে যেন দ্রুত অফিস থেকে ছুটি ম্যানেজ করে নিল। বিকালে তিনজনে রওয়ানা হয়ে গেলাম কক্সবাজারের পথে। পথে বৃষ্টি শুরু হ'ল। মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। কারণ বৃষ্টিভেজা প্রকৃতির উচ্ছল সাঁজ মানেই ভ্রমণ স্বার্থক হয়ে ওঠা।

রাত সাড়ে ১২টায় পৌঁছলাম কক্সবাজার শহরে। অফ সিজনের কারণে হোটেল গুলি প্রায় শূন্য। ইজি বাইকের ড্রাইভার তার পরিচিত হোটেলে নেওয়ার জন্য তৎপর। কিন্তু সাইফুল ভাই যে আগে থেকেই হোটেল স্যানোভায় রুম ঠিক করে রেখেছে। ফলে তার কোন উপকার করা গেল না। হাল্কা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমাতে ঘুমাতে রাত দুইটা পার হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কি! ফজরের আযান হতে না হতেই আমাদের অটো এলার্ম কাফী ভাইয়ের ডাক। রেডি হয়ে চললাম মসজিদ পানে। ছালাত শেষে রওয়ানা হলাম বীচের দিকে। ইজি বাইকের ড্রাইভার ভাইয়ের জিজ্ঞাসা, বীচের ডায়াবেটিস পয়েন্টে যাবেন কি-না। আমরা হাসতে লাগলাম। ডাইবেটিস ঘরে ঘরে যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, তাতে আগামী দিনে আরও কতকিছুর সাথে ডায়াবেটিস যুক্ত হবে কে জানে। সে যাই হোক ডায়াবেটিকস রোগীদের সৌজন্যে স্থানটি অমন নামে অভিহিত হয়েছে। সমুদ্রে এদিকটায় সাধারণতঃ ডায়াবেটিস রাগীরাই আসেন। আমরা ডায়াবেটিসমূক্ত আলহামদুলিল্লাহ। তাই লাবনী পয়েন্টই বেঁছে নিলাম। ভেবে অবাক হলাম দীর্ঘ ১১ বছর পর এলাম কক্সবাজার। কতদ্রুতই না জীবনের সময়গুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। ভোরের নির্জন সমুদ্রতটে, উন্মুক্ত বাতাসে, মাদকতাময় নির্বিরাম ঢেউয়ের তোড়ে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটিয়ে ফিরে গেলাম হোটেলে। নাস্তা সেরে কাপড়-চোপড় নিয়ে আবার ফিরে এলাম গোসল সারতে। সপ্তাহখানেক পূর্বেই জলোচ্ছাস হয়ে যাওয়ায় সমুদ্র ছিল বেশ উত্তাল। তাই ঘন্টাখানিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েও বেশী গভীরে যেতে পারলাম না। অবশেষে সাগরের মায়া কাটিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য মহেশখালী। বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ মহেশখালী। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ শত বছর পূর্বে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই দ্বীপের সৃষ্টি হয়। কক্সবাজার থেকে মাত্র ১২ কি.মি. দূরে অবস্থিত এই দ্বীপটিতে এখন তিন লক্ষাধিক মানুষের বসবাস। যার ৯০ শতাংশই মুসলিম। এখানে প্রায় সাড়ে চারশ' মসজিদ ও অর্ধ শতাধিক মাদ্রাসা রয়েছে। যাতায়াতের জন্য দু'টি পথ। সড়ক পথে চকরিয়া থেকে বদরখালী হয়ে যেকোন পরিবহনে অথবা কক্সবাজার থেকে ট্রলার বা স্পীড বোটে।

আমরা বোট যাত্রাকেই অগ্রাধিকার দিলাম। হোটেল থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত কস্তুরী ঘাট বা ৬ নম্বর ঘাটে গিয়ে অন্যান্য যাত্রীদের সাথে উঠে পড়লাম স্পীডবোটে। বোট চলতে শুরু করল তার আপন গতিতে। দু'পাশে সারি সারি জলাবন আর সামনে দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল পানিরাশি। সমুদ্র বেশ উত্তাল থাকায় একটু গভীরে যেতেই রীতিমত নাচন শুরু হয়ে গেল ছোট্ট বোটটির। ৩-৪ ফুট উপরে উঠে পরক্ষণেই ধপাস করে পানিতে আছাড় খাচ্ছে। সবমিলিয়ে দুলকি চালে ২৫ মিনিটের বোট যাত্রা বড়ই রোমাঞ্চকর হ'ল।

ঘাটে নামতেই রিকশা ও ইজিবাইক ওয়ালাদের ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেল। বুঝে শুনে একটা রিকশা ঠিক করে ফেললাম। এখানকার দর্শনীয় স্থান হ'ল- মৈনাক পাহাড়, শুটকী মহাল, লবণ মাঠ, গোরকঘাটা জমিদারবাড়ী, আদিনাথ মন্দির, বৌদ্ধ প্যাগোডা ইত্যাদি। শুরুতেই ঘোরকঘাটা বৌদ্ধ বিহারের একটি প্যাগোডায় নিয়ে গেল রিকশাওয়ালা। সাজানো গোছানো ছবির মত সুন্দর পরিবেশ। ভিতরে ক'জন ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। মুর্তির সামনে নানা পদের পানীয় সহ সারি সারি খাবার। যেন ঘুম থেকে উঠেই খেতে বসবে।

Contents

পাশেই আরেকটি প্যাগোডায় গেলাম। দেখি মূর্তির সামনে একজন পূজা দিচ্ছে। হাতজোড় করে সশব্দে কতকিছু যে বলছে, তার আগামাথা বোঝার সাধ্য নেই আমাদের। তারপর চলে আসলাম বিখ্যাত আদিনাথ মন্দিরে। সমূদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৮৮ ফুট উঁচু মৈনাক পাহাড় চুড়ায় অবস্থিত এই মন্দিরটি। অনেকগুলি সিড়ি মাড়িয়ে প্রবেশ করলাম সেখানে। দেখি মন্দিরের লোকেরা বার বার আড়চোখে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। জঙ্গীবাদের উত্তাপে যখন টগবগ করেছে দেশ, সেই মুহূর্তে আমাদের মত বেশভূষাধারীদের দেখে ভয় পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ঠাট-বাট বজায় রেখে আমরা ঘুরেফিরে দেখলাম সবকিছু। পাহাড়ের উপর থেকে পুরো দ্বীপটা দেখতে অনেক মনোরম। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে নেমে এসে দ্বীপের মিষ্টি ডাব খেয়ে ফিরে এলাম জেটি ঘাটে। ফিরতি পথে ইঞ্জিন চালিত বড় নৌকা পেয়ে উঠে বসলাম তাতে। প্রায় ১ ঘন্টা সময় লাগলেও বেশ মজা পেলাম এই যাত্রা পথে।

দুপুরের খাবার খেয়ে রওনা হলাম হিমছড়ি ও ইনানী বীচের উদ্দেশ্যে। ৬৫০ টাকা চুক্তিতে ইজিবাইক ভাড়া করে চললাম অনিন্দসুন্দর মেরিন ড্রাইভ রোড ধরে। একপাশে পাহাড় আরেকপাশে সাগরবেষ্টিত মসৃণ এই সড়কটিকে দেশের সুন্দরতম সড়ক। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নির্মিতব্য ৮২ কি.মি. দীর্ঘ এই সড়কটি টেকনাফে গিয়ে শেষ হয়েছে। বর্তমানে ৪৮ কি.মি.-এর কাজ শেষ। বাকী অংশের কাজ চলমান। কক্সবাজার থেকে ৮ কি.মি. দূরে হিমছড়ি পর্যটন কেন্দ্র। আর ২৪ কি.মি. দূরে উখিয়া উপযেলার অন্তর্গত ইনানী বীচ। প্রথমে গেলাম কোরাল পাথর ঘেরা ইনানীতে। প্রায় জনমানবশুন্য বীচে সমুদ্রের নীল পানিরাশির মধ্যে সারি সারি কালো প্রবাল পাথরের মেলা। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে খেলা করছে ছোট ছোট লাল কাকড়া। চারিদিকে শামুক আর ঝিনুকের ছড়াছড়ি। পাথরগুলি ভাটির সময় দৃশ্যমান হয়। আবার জোয়ারে ডুবে যায়। আমরা বিকালের শুরুতে যাওয়ায় তখন পাথরস্তুপ অনেকটাই ডুবে গেছে। কিছুক্ষণ পানির মধ্যে কাটিয়ে, শৈশবের আনন্দে এ পাথর থেকে সে পাথর লাফালাফি করে ফিরে আসলাম। বীচের পাশে বড় বড় সাইজের ডাব দেখে না থেমে পারলাম না। কারণ আগে থেকেই এখানকার ডাবের তীব্র মিষ্টতা সম্পর্কে জানা ছিল। তারপর ফিরে চললাম হিমছড়ির উদ্দেশ্যে। বাইক থেকে নেমে সোজা পাহাড়ের মাথায়। শেষ বিকালে প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু পাহাড়চূড়া থেকে সমুদ্রের ফেনিল ঢেউগুলির উপকূলে আছাড় খাওয়ার সুন্দর দৃশ্য মানসপটে বন্দী করে ফিরে চললাম পরবর্তী গন্তব্যে।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দ্রুত ব্যাগ গুছিয়ে চট্টগ্রামগামী বাসে উঠে পড়লাম। এভাবেই তৃপ্তিময় একটি দিন কাটিয়ে রাত্রি ১২ টায় পৌঁছে গেলাম বোনের বাসায়।

পরদিন ফজর ছালাত আদায়ের পর শুরু হ'ল পরবর্তী গন্তব্য খাগড়াছড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি। ভোর ৬-টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম অক্সিজেন বাস স্ট্যাণ্ডে। যেখান থেকে প্রতিদিন ৬-টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ১ ঘন্টা পর পর শান্তি পরিবহনের বাস ছেড়ে যায় খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে। ৭-টার ২য় ট্রিপে রওয়ানা হলাম। কিছু সময় পার হতেই দেখা মিলতে শুরু করল সবুজ পাহাড়ের সারি। পথে ফোন দিলাম ফরিদপুরের নতুন আহলেহাদীছ, বর্তমানে রাজশাহীতে স্থায়ীভাবে হিজরত করে আসা সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত মাসঊদ ভাইকে। উনি সরাসরি বাঘাইছড়ির বাঘাইহাট এলাকায় অবস্থিত ১০ নম্বর সেনাক্যাম্পে চলে আসার জন্য বললেন। বেলা সাড়ে ১০-টায় আমরা পৌঁছালাম খাগড়াছড়ি শহরে। অটোতে চড়ে চলে এলাম দিঘিনালাগামী পরিবহন স্ট্যান্ডে। উঠে বসলাম একটি চাঁদের গাড়িতে। আমাদের মুখোমুখি বসা সুন্দর দাড়িওয়ালা একজন ভাইকে দেখে পরিচিত হলাম। জানলাম তিনি দিঘিনালা উপযেলা মসজিদের ইমাম। প্রথমে তিনি আমাদেরকে তাবলীগ জামা'আতের সাথী মনে করলেও পরে আমাদের উদ্দেশ্য জেনে আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে শংকা জানিয়ে বললেন, গতকালও এখানে একজনকে কে বা কারা কুপিয়ে হত্যা করেছে।

অপরাধের উপত্যাকা হিসাবে দিঘিনালা সম্পর্কে আগে থেকেই কিছুটা ভীতি রয়েছে। তার কথায় তা একটু বৃদ্ধি পেল। ৩৫ মিনিটে পৌঁছে গেলাম দিঘিনালা। এখান থেকেই সাজেকগামী ল্যাণ্ড ক্রুজার, চাঁদের গাড়ি, সিএনজি বা মটরসাইকেল ভাড়া নিতে হয়। তবে আমাদের লক্ষ্য ভিন্ন হওয়ায় ভাড়া হোন্ডায় চেপে চলে আসলাম সেনাবাহিনীর ১০ নং ক্যাম্পে। মাসঊদ ভাই এসে নিয়ে গেলেন ক্যাম্পের ভিতরে। সুন্দর সাঁজানো গোছানো ক্যাম্প। টিলার মাথায় বাঁশ নির্মিত অতিথিশালা। সেখানে আবার বাঁশের সোফাসেট ও খাট। লাইট-ফ্যান। এমনকি টয়লেটে হাইকমোড। জানালা দিয়ে দেখা মেলে সবুজ চাদরে ঢাকা পাহাড়ের সারি। আর সাথে নির্মল বায়ু প্রবাহ। মনে হচ্ছিল এ ঘরেই কাটিয়ে দেই সপ্তাহটা। ভাই বললেন, দাড়িওয়ালা মানুষ আসবে বলে আমাকে একদিনের জন্য অনুমতি নিতেই অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।

যাইহোক জুম'আর দিন। তাই কাপড়-চোপড় ছেড়ে পুকুরে গোসল সেরে স্থানীয় মসজিদে জুম'আ পড়লাম। মসজিদ ভরা মুছল্লী দেখে মনটা ভরে গেল। কিন্তু খত্বীব ছাহেবের নিষ্প্রাণ ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য শুনে যথারীতি মনটা খারাপ হয়ে গেল। ছালাতের পর পাশে অবস্থিত বেশ বড় একটা হেফয খানা পরিদর্শন করে ফিরে এলাম অতিথিশালায়। এবার খাদ্যগ্রহণের পালা। ভাই জানালেন যে, এসব স্থানে ভেজাল খাবারের কোন অস্তিত্ব নেই। তাই সবকিছুর স্বাদের একটু ভিন্নতা। তাঁর নিজ হাতে রান্না করে মুরগীর বিরানী খেয়ে সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পারলাম। তাইতো তিনজনে বড় এক গামলা বিরানী মুহূর্তেই সাবাড় করে ফেললাম। তবে এ যাত্রায় ক্যাম্পের গা ঘেষে বয়ে যাওয়া কাচালং নদীর অনন্য স্বাদের মাছের কথা কেবল শুনেই ক্ষান্ত হলাম এবং ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিলাম।

এরই মাঝে দুপুর ৩টা পার হয়ে গেল। খবর এলো সেনাবাহিনীর সাজেকগামী স্কট চলে এসেছে। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে চেপে বসলাম যাওয়া-আসা বাবদ ২৪০০ টাকা চুক্তিতে ভাড়া করা দু'টি মটরসাইকেলে। পর্যটকদের জন্য ঝুকিপূর্ণ হওয়ায় বেলা ১০টা ও দুপুর ৩টায় সেনা পাহারায় সাজেকগামী পর্যটকবাহী গাড়ীগুলি যাওয়া আসা করে। অফটাইম ও বিকালের ট্রিপ হওয়ায় সামনে কেবল একটা কার, তারপর আমরা এবং পিছনে বাহিনীর গাড়ি। পাহাড়ের উঁচু-নীচু ও আঁকা-বাকা পথে হোন্ডায় চলার যে কি চমৎকার অনুভূতি তা কেবল অভিজ্ঞরাই জানেন। ৩৪ কি.মি.

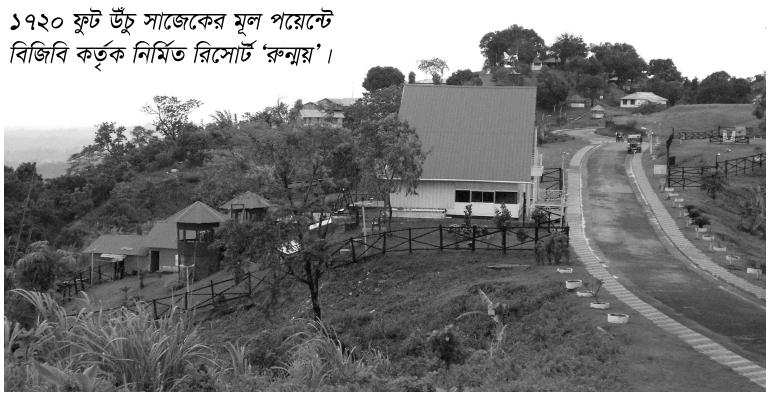

১৭২০ ফুট উঁচু সাজেকের মূল পয়েন্টে বিজিবি কর্তৃক নির্মিত রিসোর্ট 'রুন্ময়'।

পথযাত্রার কিছুদুর যেতে না যেতেই নেমে আসলো বৃষ্টি। কেবল আমাদের জন্য পুরো স্কট থেমে থাকবে তা কি হয়! দল এগিয়ে চলল। আমরা ভিজতে লাগলাম। আমাদের অবাধ্য যাত্রায় মেঘগুলি যেন বিরক্তই হ'ল। এবার শুরু হ'ল ঝুম বৃষ্টি। বাধ্য হয়ে হোন্ডা থামিয়ে আশ্রয় নিলাম ছোট্ট একটি দোকানে। পুরো স্কট অপেক্ষমান। কেবল আমাদের জন্য দাড়াতে হচ্ছে দেখে বাহিনীর সদস্যরাও যেন বিরক্ত। আগত্যা আমাদের তিনজনকে তাদের খোলা জীপে নিয়ে নিলেন। হোন্ডাদু'টিও চলতে থাকলো সাথে সাথে।

আধাঘন্টার মত চলার পর বৃষ্টির তেজ কমে এলো। গাড়ি থেকে নেমে উঠে পড়লাম হোন্ডায়। কিছুদুর গিয়ে একটা দোকান থেকে বিশাল সাইজ পলিথিন কিনে তাতে সবগুলি ব্যাগ ভরে দিয়ে আবার যাত্রা শুরু হ'ল। একটু পর আবার বৃষ্টির প্রকোপ। এবার ব্যাগগুলো না ভেজার গ্যারান্টি পেয়ে সবাই ভিজতে লাগলাম মনের আনন্দে। একটু পর বৃষ্টি থেমে গেল। বৃষ্টিভেজা সারি সারি পাহাড় প্রাণ ভরে দেখতে দেখতে একসময় দেখি আশপাশ প্রবল কুয়াশার মত মেঘে ছেড়ে গেল। ১০ মিটার দুরের বস্তুও দেখা কষ্টকর ঠেকছে। তাই পথের শেষভাগ কিছুটা বিপজ্জনক মনে হলেও আল্লাহ্‌র রহমতে এর মধ্যদিয়েই আমরা পৌঁছে গেলাম সাজেক পয়েন্টে।

সাজেক হল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন। ৬০৭ বর্গমাইল আয়তন। রাঙামাটির একেবারে উত্তরে এর অবস্থান। ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী সর্বশেষ পাহাড়চূড়ার জঙ্গল পরিষ্কার করে নির্মিত আর্মি ক্যাম্প ও বিডিআর বিওপিই বর্তমান সাজেক পয়েন্ট। এখান থেকে পূর্বদিকে মিজোরাম বর্ডারের দূরত্ব একদিনের হাঁটা পথ, আর উত্তরের ত্রিপুরা সীমান্ত তিন দিনের যাত্রা। তাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন পাহাড় আর গহীন অরণ্যে ঘেরা এই সীমান্ত রেখা প্রাকৃতিকভাবেই সুরক্ষিত।

সাজেক আর্মি ক্যাম্পের কাছাকাছি পাহাড়ী আদিবাসীদের দু'টি পাড়া আছে। রুই লুই এবং কংলাক। সাজেক পয়েন্টে যাবার একটু আগেই পড়ে রুই লুই পাড়া। এই পাড়াটির উচ্চতা ১৭২০ ফুট। এটি ক্ষুদ্র জাতীগোষ্ঠী পাংখোয়াদের বসতি। ঘন মেঘের কারণে পাড়াটির তেমন কিছুই নযরে আসলো না। হোন্ডাচালক ভাইয়েরা পাংখোয়াদের একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করতে চাচ্ছিল। কিন্তু মাসঊদ ভাইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সাজেকের মূল পয়েন্টে অবস্থিত এবং বিডিআর পরিচালিত অনিন্দসুন্দর রিসোর্ট 'রুন্ময়'-এর পাশ্ববর্তী আর্মি পরিচালিত হোটেল 'রক প্রশান্তি'তে গিয়ে উঠলাম। সিট ভাড়া প্রতিজন মাত্র ৩০০ টাকা। ১০ জনের রুমে কেবল আমরাই। বাইকচালকদের পরদিন সকালে এসে নিয়ে যেতে বললাম। তারপর ব্যাগপত্তর খুলে দেখি অর্ধেক কাপড় ভিজে শেষ। দড়ি টানিয়ে সব শুকাতে দিলাম। তারপর বাইরে এসে তো অবাক। মেঘের দল স্থানান্তর করেছে। সব নেমে গেছে চূড়া থেকে অনেক নীচে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়া সত্বেও বৃষ্টিভেজা পাহাড় চকচক করছে। ***(ক্রমশঃ)***

মাসিক আত-তাহরীক
www.at-tahreek.com
নিয়মিত প্রকাশনার ২০ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা
মার্চ ২০১৭
লেখা আহবান
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
৩০ জানুয়ারী ২০১৭

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫
মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯,
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

সংগঠন সংবাদ

‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন

রাজশাহী ২৫শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়া রাজশাহীতে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ‘যুবসংঘ’ -এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সম্মেলনে ‘যুবসংঘ’-এর ২০১৬-২০১৮ সেশনের পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়।

২০১৬-২০১৮ সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

	নাম	পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	সাংগঠনিক মান	যেলা
১	আব্দুর রশীদ আখতার	সভাপতি	কামিল	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য	কুষ্টিয়া
২	মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম	সহ-সভাপতি	দাওরায়ে হাদীছ; এম,এ	ঐ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
৩	মুস্তাক্বীম আহমাদ	সাধারণ সম্পাদক	বি,এ	ঐ	রাজশাহী
৪	শেখ আব্দুছ ছামাদ	সাংগঠনিক সম্পাদক	দাওরায়ে হাদীছ; এম,এ	ঐ	সাতক্ষীরা
৫	আব্দুল্লাহিল কাফী	অর্থ সম্পাদক	এম,এ	ঐ	রাজশাহী
৬	আবুল বাশার আব্দুল্লাহ	প্রচার সম্পাদক	কামিল	ঐ	মেহেরপুর
৭	আবুল কালাম	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	কামিল	ঐ	জয়পুরহাট
৮	ইহসান ইলাহী যহীর	ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক	দাওরায়ে হাদীছ; বি,এ, অনার্স (অধ্যয়নরত)	ঐ	কুমিল্লা
৯	মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল	তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক	এম,কম	ঐ	নারায়ণগঞ্জ
১০	মুখতারুল ইসলাম	সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	দাওরায়ে হাদীছ; এম,এ	ঐ	রাজশাহী
১১	সা‘দ আহমাদ	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	এস,এস,সি	ঐ	মেহেরপুর
১২	মিনারুল ইসলাম	দফতর সম্পাদক	বি,এ,অনার্স (অধ্যয়নরত)	কর্মী	রাজশাহী

প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৬শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পূর্ব পার্শ্বস্ত মসজিদের ২য় তলায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক লেখক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং মারকাযের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। প্রশিক্ষণে ৩৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

কমিটি গঠন

গত ২৫শে আগস্ট’১৬ ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠনের পরে দেশব্যাপী যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। এ উপলক্ষে ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যেলা সমূহে সফর করেন। যেলা সমূহ পুনর্গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হ’ল।-

(১) কুমিল্লা ১৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম‘আ ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে শহরের শাসনগাছা ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি জা‘ফর ইকরামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর অর্থ সম্পাদক আমজাদ হোসাইন, ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুর রহমান ও দফতর সম্পাদক বেলাল হুসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ইউসুফকে সভাপতি ও আহমাদুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(২) নওদাপাড়া, রাজশাহী ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে রেযাউল করীমকে সভাপতি ও রেযাউল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৩) সিরাজগঞ্জ ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সিরাজগঞ্জ যেলা ‘যুবসংঘে’র উদ্যোগে শহরের চকশাহবাগপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা

'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতীন ও দফতর সম্পাদক আমীনুল ইসলাম খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শামীম আহমাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ওয়াসীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৪) গাংণী, মেহেরপুর ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে গাংনী উপযেলাধীন চৌগাছা দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে সভাপতি ও নাজমুল হুসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৫) নওগাঁ ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর নওগাঁ যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসায়নের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে আব্দুর রহমানকে সভাপতি ও মুজাহিদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৬) নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৭শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'যুবসংঘ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হায়দার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ হায়দার আলীকে সভাপতি ও আজমাল হুসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। একই দিন বাদ মাগরিব কাওছার আহমাদকে সভাপতি ও আব্দুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৭) জলঢাকা, নীলফামারী ২৮শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর 'যুবসংঘ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে জলঢাকা উপযেলাধীন শৌলমারী বাঁশওয়াপাড়া পুরাতন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল জলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম ও দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আশরাফ আলীকে সভাপতি ও শহীদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৮) রংপুর ২৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'যুবসংঘ' রংপুর যেলার উদ্যোগে শহরের পূর্ব খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শিহাবুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম ও দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার খায়রুল আযাদ। অনুষ্ঠানে শিহাবুদ্দীন আহমাদকে সভাপতি ও মোখলেছুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৯) আদিতমারী, লালমণিরহাট ৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় 'যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে যেলার আদিতমারী উপযেলাধীন মহিষখোঁচা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল কাইয়ূমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম ও দফতর সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমান। অনুষ্ঠানে আব্দুল কাইয়ূমকে সভাপতি ও আব্দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(১০) বাগাতিপাড়া, নাটোর ৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলার উদ্যোগে যেলার বাগাতিপাড়া উপযেলাধীন যোগীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি বুলবুল আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অনুষ্ঠানে মাজেদুর রহমানকে সভাপতি ও মা'ছূম বিল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব

আরব বিশ্বে গণতন্ত্রের কি হ'ল!

আরব দেশের একটা গল্প আছে। একবার এক জেলে সাগরে জাল ফেলেছে। বিরাট এক ডেকচি উঠে এল। জেলে তো মহা খুশী। পেয়ে গেছি সাত রাজার ধন! কিন্তু যে-ই না ডেকচির ঢাকনাটা খুলেছে, অমনি ঘটে গেল তেলেসমাতি। ডেকচি থেকে একগাদা ধোঁয়া বের হয়ে তা আকাশছোঁয়া দৈত্য হয়ে গেল। এখন সেটা জেলেকে খাবে। জেলে তো ভয়ে আধমরা। কি করে, কি করে? চকিতে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। দৈত্যকে বলল, আমাকে আপনি খাবেন, এ তো আমার সৌভাগ্য! কিন্তু এত বড় ধড়টা কীভাবে ওই পুঁচকে ডেকচিতে ভরে রেখেছিলেন, তা যদি একটু দেখাতেন, তাহ'লে মরেও শান্তি পেতাম। মাথা মোটা দৈত্য আবার ধোঁয়া হয়ে ডেকচির ভেতর ঢুকল। জেলে অমনি ডেকচির মুখটা ভালো করে আটকে সেটাকে আবার সাগরে ডুবিয়ে দিল ।

আরব বিশ্বে গণতন্ত্রের বর্তমান চেহারার সঙ্গে এই গল্পের বেশ মিল রয়েছে। চলতি দশকের শুরুতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরব বসন্ত নামের যে বিপুল গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিণতি যেন এমনই। যাদের ওপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়, প্রত্যাশী মানুষকে তারা দানবের চেহারা দেখিয়েছে। অতিষ্ঠ জনতা পরে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পরিণতিতে আরব বিশ্বের একাধিক দেশে ফিরে এসেছে স্বৈরশাসন।

আরব বসন্ত শুরু হয়েছিল **তিউনিসিয়ায়**। ২০১০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর নিজের গায়ে নিজেই আগুন ধরিয়ে দিয়ে বিপ্লবের মশাল জ্বেলে দেন ফেরিওয়ালা বাওয়াজিজি। ঘুষ, দুর্নীতি, বেকারত্ব, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তা ছিল এক জ্বলন্ত বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের আগুন গোটা আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই স্বৈরশাসনের বিলুপ্তি ঘটে। স্বৈরশাসক জয়নাল আবেদীন বেন আলীর পতনের পর সেখানে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এখন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত বটে, তবে অভ্যন্তরীণ সমস্যার অন্ত নেই। পশ্চিমারা বলছে, আরব বিশ্বে তিউনিসিয়া গণতন্ত্রের একটি রোল মডেল।

বাস্তবে সেখানে দলাদলি, হানাহানি লেগেই আছে। আছে জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের উৎপাত। সেখানে সরকারবিরোধী তৎপরতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সরকারের সমালোচনা তো দূরে থাক, কেউ টুঁ শব্দটি করলে তাকে পাকড়াও করা হয়, চলে নির্যাতন।

আরব বসন্তের গণজাগরণে **মিসরের** লৌহমানব হুসনী মোবারকের স্বৈরশাসন খড়-কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি আবহ তৈরী হয়। ২০১২ সালের নির্বাচনে ইসলামপন্থী মুসলিম ব্রাদারহুডের হাত ধরে ক্ষমতায় আসেন মুরসী। শুরু থেকেই মুসলিম ব্রাদারহুডের মধ্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। মুরসী একাধিক ডিক্রি জারির মাধ্যমে তা নিশ্চিত করার প্রয়াস চালান। এতে দেশের বেশীর ভাগ মানুষই নাখোশ হয়। সেনাবাহিনীর সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয় মুরসীর। এ সময় মুরসীর বিরুদ্ধে জনরোষকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসেন সেনাপ্রধান জেনারেল আব্দুল ফাত্তাহ সীসী। তিনি মোবারক আমলেরই একজন শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা। এখন প্রেসিডেন্ট সীসীই দেশ চালাচ্ছেন। ঘুরেফিরে মিসরে এসেছে সেই স্বৈরশাসক।

লিবিয়া এখন জীবন্ত রণক্ষেত্র। ২০১১ সালের অক্টোবরে মু'আম্মার গাদ্দাফীর ৪২ বছরের শাসনামলের পতন ঘটার পর থেকে সেখানে মারামারি-কাটাকাটি লেগেই আছে। বার্তা সংস্থা এএফপির তথ্যমতে, সেখানে প্রায় ১ হাজার ৭০০টি সশস্ত্র গোষ্ঠী ও দল ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত। মাঝখান থেকে ফায়দা লুটতে সেখানে শিকড় গেড়েছে আইএস ও আল-কায়েদার মতো জঙ্গী সংগঠনগুলো। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো লিবিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যের সরকার গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ ডামাডোল থামার লক্ষণ নেই।

ইয়েমেনেও সেই একই অবস্থা। গণজোয়ারের প্রবল তোড় উপেক্ষা করে খুঁটি গেড়ে বসেই ছিলেন প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ ছালেহ। একপর্যায়ে তাঁর বাড়িতে বোমা ফেলা হ'ল। কোনোমতে বেঁচে সঊদী আরবে ভাগলেন তিনি। পোড়া চেহারা নিয়ে ফিরে এসে ক্ষমতা ছেড়েও দিলেন। কিন্তু শান্তি তো নেই। ২০১৪ সালে বর্তমান প্রেসিডেন্ট আবদু-রাব্বু মানসুর হাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হলে আবার সেই ডামাডোল ফিরে আসে। এই বিদ্রোহের মূলে রয়েছে ছালেহ্‌র অনুগত হুথী গোষ্ঠীর মানুষ। হাদির পক্ষে আবার লড়ছে সঊদী নেতৃত্বাধীন জোট। ২০১৫ সালের মার্চ থেকে এই জোটের বিমান হামলায় এ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাযার লোক নিহত হয়েছে। বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ মানুষ। এরপরও হুথী বিদ্রোহীরা কিন্তু বহাল তবিয়তেই আছে। সেখানে খাদ্যসংকট চরমে উঠেছে, যার ভুক্তভোগী হচ্ছে শিশুরা।

আর **সিরিয়ার** যুদ্ধ যেন শেষ হওয়ার নয়। পুরো দেশটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। শুরুতে প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে উৎখাতে বিদ্রোহীদের সশস্ত্র আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির পশ্চিমা কিছু মিত্রও মদদ দিয়েছে। এতে বাশারের সেনারা অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পরে বাশারের পক্ষে রাশিয়া কঠোর অবস্থান নিলে পরিস্থিতি দাঁড়ায় সেয়ানে সেয়ানে টক্করের মতো। মাঝখানে ফায়দা লুটতে হাযির হয় আইএস ও সহযোগী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর জঙ্গী ও জিহাদীরা। এখন দেশটিতে কয়েকটি পক্ষের মধ্যে চলছে বহুমুখী লড়াই। এর মধ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যস্থতায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ও রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ একাধিকবার যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনায় বসেছেন। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

বিশ্বব্যাংক বলছে, আরব বসন্তের ঝড়ঝাপটায় যেসব দেশে সরকার বা শাসন বদল হয়েছে, সেসব দেশ আগেই বরং ভালো ছিল। আরব বিশ্বের অন্য যেসব দেশে আরব বসন্ত আসেনি, সেসব দেশের শাসকেরা এর মধ্যে শিক্ষা যা নেওয়ার নিয়েছেন। যেমন সঊদী সরকার ভিন্নমতাবলম্বীদের সঙ্গে বিরোধে না গিয়ে তাদের সাথে সমাঝোতার চেষ্টায় সফল হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গণপরিসেবা ইত্যাদি খাতে জনসেবার হার বাড়িয়ে জনতার মন জয় করেছে। সঊদী নাগরিকদের বেশী করে দেওয়া হচ্ছে বিনিয়োগ ও আয়ের সুযোগ। কাতার, জর্ডান, মরক্কো ও ওমানের মতো দেশগুলোতেও শাসকের ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে কুক্ষিগত না করে কিছু ক্ষেত্রে জনতার হাতে দেওয়া হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা। অন্যদিকে মিসর, লিবিয়া ও ইরাকে স্বৈরশাসকের পতনের পরিস্থিতি কি দাঁড়িয়েছে, সেটাও এখন ভালোভাবেই টের পাচ্ছে আরব বিশ্বের মানুষ। একনায়ক উৎখাতের আন্দোলনে নেমে সিরিয়ার মতো দুর্ভাগ্য ডেকে আনতে কেউ আর ইচ্ছুক নয়।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ)

১. ২০১৬ সালের সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ৮ম।
২.সর্বশেষ কোন ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানে?
উত্তর : রোয়ানু।
৩. 'দুবলার চর' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে।
৪. বাংলাদেশের জলবায়ু কি নামে পরিচিত?
উত্তর : ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু।
৫. বাঘা মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : রাজশাহী যেলায়।
৬. 'ইনানী' সমুদ্র সৈকত কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : কক্সবাজার যেলায়।
৭. ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে কত সালে?
উত্তর : ১৮৫৮ সালে।
৮. 'হোসনি দালান' কোন মোগল সম্রাটের আমলে তৈরী?
উত্তর : সম্রাট শাহজাহান।
৯. 'ঢাকা গেট'কে নির্মাণ করেন?
উত্তর : মীর জুমলা।
১০. ঢাকায় প্রথম রাজধানী স্থাপন কে?
উত্তর : সুবেদার ইসলাম খান।
১১. প্রশ্ন : বাংলাদেশের বৃহত্তম মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণ ফোন ০১৭ সিরিজের পাশাপাশি কোন সিরিজ ব্যবহারের অনুমতি পায়?
উত্তর : ০১৩ সিরিজের।
১২. প্রশ্ন : দেশের প্রথম চারলেন এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : ৫৫ কিমি।
১৩. অভ্র কীবোর্ড তৈরী করেন কে ?
উত্তর : মেহেদী হাসান ।
১৪. সরকারী কর্মকর্তাদের 'মেসেজিং অ্যাপ'-এর নাম কি?
উত্তর : আলাপন।
১৫. স্মার্ট কার্ড কি?
উত্তর : জালিয়াতি রোধে জাতীয় পরিচয় পত্রের আধুনিক রূপ।
১৬. স্মার্ট কার্ড কবে থেকে বিতরণ শুরু হয়?
উত্তর : ২ অক্টোবর ২০১৬ ।
১৭. দেশের প্রথম এলিভেটেড ওয়াকওয়ে বা উড়াল ফুটপাতের দৈর্ঘ্য কত এবং কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ১,১২০ মিটার, গুলিস্থান, ঢাকা।
১৮. বাংলাদেশে-ভারত মৈত্রী ভবন নির্মিত হচ্ছে কোথায়?
উত্তর : সারদা, রাজশাহী।
১৯. পদ্মা সেতুর প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য কাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে?
উত্তর : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে।
২০. সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতা দমনে চালু হওয়া পুলিশের নতুন ইউনিটের নাম কী?
উত্তর : পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেরোরিজম (পিবিসিটি)।

সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)

১. ২০১৬ সালে ল্যানসেটের বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিবেদনে সবচেয়ে ভালো দেশ কোনটি?
উত্তর : আইসল্যান্ড; সবচেয়ে খারাপ দেশ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র।
২. বিশ্বের প্রথম ধুমপানমুক্ত দেশ কোনটি?
উত্তর : ভুটান।
৩. বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের ভাষা কি ?
উত্তর : চীনা, মান্দারিন।
৪. পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ রাষ্ট্র কোনটি?
উত্তর : গ্রিনল্যান্ড।
৫. পৃথিবীতে সর্বাধিক দ্বীপ রাষ্ট্র কোনটি?
উত্তর : ইন্দোনেশিয়া।
৬. 'দেশ ভালো হয় যদি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালো হয়' উক্তিটি কার?
উত্তর : পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।
৭. প্রশ্ন : 'রোজিগাত' ও 'মালিয়া' কোনা দেশের আদিবাসী গোষ্ঠী?
উত্তর : সুদান।
৮. 'ইতিহাস হচ্ছে অভিজাত শ্রেণীর সমাধি ক্ষেত্র' উক্তিটি কার?
উত্তর : প্যারেটো।
৯. ৩২২ বছরের ইতিহাসে সম্প্রতি নিম্নতম সুদহার নির্ধারণ করে কোন দেশ?
উত্তর : ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।
১০.'বজ্র বোল্ট' নামে খ্যাত গতিমানব উসাইন বোল্ট অলিম্পিকে কতটি স্বর্ণপদক লাভ করেন?
উত্তর : ৯ টি
১২. ইউরোপের সাম্প্রতিক সবচেয়ে বড় সমস্যা কি?
উত্তর : অভিবাসী সংকট।
১৩. 'ইউরোপ-১' (Europe-১) কী?
উত্তর : ফ্রান্সভিত্তিক রেডিও স্টেশন।
১৪. প্রশ্ন : 'পিস আর্ক' কী?
উত্তর : চীনা নৌবাহিনীর ভাসমান হাসপাতাল।
১৫. Global Zero' কি ?
উত্তর : বিশ্বকে অস্ত্রমুক্ত করার প্রকল্প।
১৬. যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম বিচারপ্রতি কে?
উত্তর : পাকিস্তান বংশোদ্ভূত আইনজীবী আবিদ রিয়ায কুরেশী।
১৭. মিয়ানমার রোহিঙ্গা সংকট সমস্যা নিরসনে গঠিত 'রাখাইন উপদেষ্টা কমিশন'-এর প্রধান কে?
উত্তর : কফি আনান (ঘানা)।
১৮. আরব দেশগুলোতে নিয়োগ করার জন্য ইরান কোন বাহিনী গঠন করে?
উত্তর : শী'আ লিবারেশন আর্মি (SLA)।
১৯.কোন দেশে সমুদ্র বন্দর নেই?
উত্তর : আফগানিস্তানে।
২০. 'বেলফোর' ঘোষণার মাধ্যমে কোন অবৈধ রাষ্ট্রের জন্ম হয়?
উত্তর : ইসরাইল।
২১. কখন থেকে ফিলিস্তীনীরা ডাক যোগাযোগের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান?
উত্তর : ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

শী'আ মতবাদ

১. শী'আ শব্দের অর্থ কি?
উত্তর : অনুসারী, গোষ্ঠী, সাহায্যকারী ইত্যাদি।
২. কিভাবে শী'আ মতবাদের সৃষ্টি হয়?
উত্তর : আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্ত শী'আ মতবাদের জন্ম হয়।
৩. শী'আরা প্রথমত কি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে?
উত্তর : রাষ্ট্রীয় ইমাম বা নেতা নিযুক্তির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে।
৪. শী'আরা কাকে অছী বলে দাবী করে?
উত্তর : আলী (রাঃ)-কে তারা অছী বলে দাবি করে।
৫. শী'আরা রাষ্ট্র ক্ষমতাকে কি মনে করে?
উত্তর : ইসলামের রুকন সমূহের একটি রুকন মনে করে *(আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক পৃঃ ৩৫৯)*।
৬. শী'আদের ফেৎনা কোত্থেকে প্রকাশিত হয়েছিল?
উত্তর : ইরাকের কূফা থেকে।
৭. শী'আ মতবাদের সূচনা হয়েছিল কি দিয়ে?
উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের উপর মিথ্যা অপবাদ ও কটূক্তির মাধ্যমে *(বুখারী হা/ ৩৭৫৩)*।
৮. কে বলেছেন শী'আরা মুসলমান নয়?
উত্তর : আব্দুল করীম শহরাস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ) ।
৯. তিনি তাদের সম্পর্কে কি বলেছেন?
উত্তর : 'শী'আদের দাবী সমূহ কুরআনের উপর দলীল নয়, মুসলিমদের উপরও নয়। কারণ শী'আরা মুসলিমদের অন্তভুক্ত নয়' *(আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ২/৭৮)*।
১০. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) (৬৬১-৭২৮ হিঃ) শী'আ রাফেযীদের সম্পর্কে কি বলেছেন?
উত্তর : 'রাফেযী ফের্কা মানুষের মধ্যে বড় মিথ্যাবাদী। আর এটা তাদের প্রাচীন অভ্যাস' *(মিনহাজুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫)*।
১১. এদের ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) কি বলেছেন?
উত্তর : 'রাফেযীদের দাবী সমূহের অন্যতম হ'ল, কুরআনের ইবারতের পরিবর্তন। কারণ তারা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তারা নতুন একটি ফের্কা। এটি এমন একটি দল যারা মিথ্যাচার ও কুফরীর দিক থেকে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের স্রোতে পরিচালিত হয়' *(আল-ফিছাল ফিল মিলাল ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫)*।
১২. আলী (রাঃ)-কে তারা কি মনে করে?
উত্তর : তারা আলী (রাঃ)-কে প্রথম খলীফা হিসাবে বিশ্বাস করে।
১৩. আল্লাহর ব্যাপারে শী'আরা কি ধরনের বিশ্বাস পোষণ করেন?
উত্তর : (ক) আল্লাহ কখনো কখনো ভুলও করেন মিথ্যাও বলেন *(ইয়াকূব কুলায়নী, উছূল-ই-কাফী, পৃঃ ৩২৮)*।
(খ) আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি না (*আনওয়ারুন নুমানিয়্যাহ, পৃঃ ২৭৮)*।
১৪. সম্মানিত ছাহাবীদের ব্যাপারে তাদের আক্বীদা কি?
উত্তর : ছাহাবীরা মুনাফিক *(ইহতিযাযে তিবরী, পৃঃ ৩৮২)*। সমস্ত ছাহাবার মৃত্যুর পর সবাই মুরতাদ হয়ে যাবে শুধুমাত্র তিন জন ব্যতীত *(রওযায়ে কাফী, পৃঃ ২৪৫)*। বিশেষ করে আনাস বিন মালেক (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ), আমর বিন আ'ছ (রাঃ), আমীর মু'আবিয়া (রাঃ),ও আয়েশা (রাঃ) সৃষ্টির সেরা নিকৃষ্ট মানুষ *(মাকামাতে হুসাইনী, পৃঃ ৫৯)*।
১৫. কুরআন সম্পর্কে তাদের আক্বীদা কি?
উত্তর : যে ব্যক্তি বলবে বর্তমান কুরআন পরিপূর্ণ সে একজন মিথ্যুক। কেননা পূর্ণাঙ্গ কুরআন হ'ল আলীর কুরআন আর তা ইমাম মাহদী নিয়ে আসবে *(নূরী তিবরী, ফাছলুফীল কিতাব তাহরীফ কিতাব রাবউল আরবাব, পৃঃ ৪)*
১৬. আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে তাদের আক্বীদা সমূহ বর্ণনা কর।
উত্তর : (ক) আবু বকর (রাঃ) কাফির এবং যে ব্যক্তি আবু বকর (রাঃ)-কে ভালবাসে সেও কাফের *(ফিক্বহুল ইয়াক্বীন, বাকের মাজলিসি পৃঃ ৬৯০)* (খ) আবু বকর (রাঃ) কাফির এবং যিন্দীক *(কাশফুল আসরার, খামিনী পৃঃ ৬৯)* (গ) আবু বকর (রাঃ) ও মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মধ্যে কোন তফাৎ নেই *(গোলাম হুসাইন নাজফী, লাজির ফিদক, পৃঃ ৬৯০)* (ঘ) আবু বকর (রাঃ) ইবলীসের এজেন্ট *(হুলইয়াতুল মাতিন, মোল্লা বাকের মাজলিসী)*। (ঙ) ইমাম মাহদী ফিরে আসলে আবু বকর (রাঃ)-কে ফাঁসিতে ঝুলাবে *(মাযমাউল মা'রিফ পৃঃ ৪৯)*। (চ) যদি জিবরাঈল (আঃ) এবং মিকাঈল (আঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে ভালবাসে তাহ'লে তারাও জাহান্নামে যাবে (আমীর মুখতার, পৃঃ ৮, মির্জা বাসরাত হুসাইন) (ছ) আমরা আল্লাহ, তাঁর নবী ও খলীফা আবু বকর (রাঃ)-কে বিশ্বাস করি না *(আনওয়ারুন নুমানিয়্যাহ, পৃঃ ২৭৮)*।
১৭. ওমর (রাঃ) সম্পর্কে তাদের আক্বীদা সমূহ বর্ণনা কর।
উত্তর : (ক) ওমর (রাঃ) প্রকৃত কাফির এবং যিন্দীক *(খামিনী, কাশফুল আসরার, পৃঃ ১১৯)*। (খ) ওমর (রাঃ) ইবলীসের এজেন্ট *(হুলইয়াতুল মাতিন, মোল্লা বাকের মাজলিসী)*। (গ) ইমাম মাহদী ফিরে আসলে ওমর (রাঃ)-কে ফাঁসিতে ঝুলাবে *(মাজমাউল মা'আরিফ পৃঃ ৪৯)*।
১৮. রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে তারা কাদেরকে দোষারোপ করেন?
উত্তর : আয়েশা ও হাফছা রাসূল (ছাঃ)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে *(হায়াতুল কুলুব পৃঃ ৮৭০, বাকের মাজলিসী)*। দু'জন পুরুষ মুনাফিক (আবুবকর, ওমর), আর দু'জন মহিলা মুনাফিক (আয়েশা, হাফছা) তারা সকলে মিলে রাসূল (ছাঃ)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে' *(হায়াতুল কুলুব পৃঃ ৭৪৫ বাকের মাজলিসী)*।
১৯. নবীদের সম্পর্কে শী'আদের আক্বীদা কি?
উত্তর : সমস্ত নবী, ফেরেশতা বার ইমামের দাস শুধুমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত *(খালিদ মানেযরা পৃঃ ৩৫, বারাকাতে আলী)*। সমস্ত নবীদের শিক্ষক হ'ল বার ইমাম শুধুমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত *(মাজমুয়ায়ে মাজলিসী পৃঃ ২৯)*। সমস্ত নবী মৃত থেকে জীবিত হয়ে আলীর নেতৃত্বে জিহাদ করবে *(তাফসীরে আয়াশী, পৃঃ ১৮১)*।
২০. খালিদ বিন ওয়ালিদ সম্পর্কে তাদের ধারণা কি?
উত্তর : খালিদ বিন ওয়ালিদ সাইফুল্লাহ নয় বরং সাইফুশ-শয়তান *(মানাযিরু বাগদাদ, পৃঃ ১০০)*।
২১. কারা তাদের ইমাম তথা নেতাকে নবীদের মত মা'ছূম বা নিষ্পাপ মনে করে?
উত্তর : শী'আরা তাদের ইমাম তথা নেতাকে নবীদের মত মা'ছূম বা নিষ্পাপ মনে করে।